সাহিত্যিকা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

দুই টাকা

দীপালী গ্রন্থশালা

আশ্বিন—১৩৫২

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
১২৩।১ আপার সার্কুলার রোডস্থ
দীপালী প্রেসে মুদ্রিত এবং
দীপালী গ্রন্থশালার পক্ষে তৎ-
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ভূমিকা

"সাহিত্যিকা" নামে যে আরও একখানি প্রবন্ধের পুস্তক আছে, এই নামকরণকালে আমি তাহা জানিতাম না, কাজেই আমার গ্রন্থখানিকে আমি উক্ত নামেই অভিহিত করিয়াছি। এ জন্য উক্ত গ্রন্থকার মহাশয়ের নিকট আমি ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

"শিক্ষাসঙ্কট" নামে যে প্রবন্ধটি গ্রন্থশেষে সংযোজিত হইয়াছে, সেটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিবন্ধরূপে ১৯৩৭ সালের ২২শে এপ্রিল হইতে ৫ই আগষ্ট তারিখের মধ্যে লিখিত হইয়া দীপালীতে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের মধ্যে "এ দেশীয় বালিকা ও নারীদের শিক্ষা" শীর্ষক অংশটি ১৯৩৯ সালে ১লা জুন দীপালীতে বাহির হইয়াছিল। একই বিষয়ের সেই খণ্ডাংশগুলিকে একত্র করিয়া শিক্ষাসঙ্কট শিরোনামায় এখন প্রকাশিত হইল। ইতি সন ১৩৫২ সালে ৫ই আশ্বিন—

কলিকাতা
১৯৪৫।২২শে সেপ্টেম্বর

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদ সুপণ্ডিত

শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্

মহাশয়ের করকমলে—

সূচী

কবির অন্যান্য গ্রন্থ

বাসন্তিকা

কবির প্রায় দেড়শত শ্রেষ্ঠ কবিতার সঞ্চয়ন

প্রিয়জনকে উপহার দিবার সম্পূর্ণ উপযোগী

মূল্য—৪৲ ড'কে—৪৷৹

কাব্য

মন্দিরা— ৸৹ গুনী— ৷৹
সপ্তস্বরা— ১৷৹ পঞ্চপাত্র— ৸৹
পত্রচিত্র— ৸৹ চিত্র ও চিত্ত ১৷৹
হবিত্রী— ৷৹ রূপ ও ধূপ—৷৹
কায়া ও ছায়া ৸৹ আলো-আঁধারি ৷৹
নামাবলী—১৲ ভবন্তী—৷৹
বেলা-বালুকা (যন্ত্রস্থ)—৷৹
গোমালিআ (যন্ত্রস্থ)—১৲

জীবনী

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি ২৷৹

প্রবন্ধ

সাহিত্য কথা (১ম ভাগ)		১৸৹
ঐ (২য় ভাগ)		১৸৹
আলোচনী	—	১৷৹
পট ও পীঠ	—	১৷৹
সাহিত্যিকা	—	২৲

গান

সুরধুনী ... ৷৹

উপন্যাস

সুন্দরী ২৷৹ দিবাস্বপ্ন ২৷৹
মায়ামৃগ ৩৲ জয়ন্তী ৩৲

বহ্নি-বলয়—৪৲
(২য় সংস্করণ যন্ত্রস্থ)

ছোট গল্প

শাপমুক্তি ১৸৹ পঙ্কজিনী ১৸৹
শিক্ষয়িত্রী ১৸৹ শেষ দান ১৸৹

নাটক

মীরাবাঈ (ধর্ম্মমূলক)	১৷৹
অবশেষে (হাস্যকৌতুক)	৷৹
চ্যারিটি শো (ব্যঙ্গ)	৷৹

ছোটদের নাটক

সতী	...	।৹
কৃষ্ণ-সুদামা	...	।৹
সাবিত্রী (স্বরলিপি সহ)		।৶৹

ছেলেদের কাব্য

মণি ও মীনু	...	১৲
নবজাতক (যন্ত্রস্থ)	...	১৷৹

প্রাপ্তিস্থান :—দীপালী গ্রন্থশালা
ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়

সাহিত্যিকা

বাংলা কাব্য

সুপ্রাচীন কালে কাব্যই ছিল রচনার একমাত্র বাহন। ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান জ্যোতিষ স্থাপত্য নক্ষত্রবিদ্যা এমন কি অঙ্কশাস্ত্র ও চিকিৎসা শাস্ত্রও কাব্যে রচিত হইত। নাটককেও সে কালে দৃশ্যকাব্য বলা হইত। রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণগুলি—একাধারে ইতিহাস জীবনচরিত ও গল্প—একালে এ ধরণের বইয়ের নাম হয়, ইতিহাসের গল্প—কাব্যে, ইহাদিগকে মহাকাব্যও বলা হয়। এক কথায়, কাব্যই সর্ব্ববিধ রচনার ব্যাপক সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইত। এই জন্য সংস্কৃত অলঙ্কারগ্রন্থগুলির নাম—কাব্যচন্দ্রিকা কাব্যপ্রদীপ কাব্যপ্রকাশ কাব্যাদর্শ প্রভৃতি। দীর্ঘকালব্যাপী এই কাব্যযুগের বহু পরে, সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থ রচিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সংস্কৃতের ইতিহাসই পুনরাবৃত্ত হইয়াছে।

জগতের সকল সাহিত্যেরই প্রথম উৎপত্তি যেমন কাব্যে এবং গানে, বঙ্গসাহিত্যের প্রথমোন্মেষও হইয়াছে তেমনি কাব্যে এবং গানে। বঙ্গ ভাষার শৈশবের সেই অসম্পূর্ণ অগঠিত ও অনিশ্চিত রূপ সহস্রাধিক বৎসরের জীবনে আজ এমন পূর্ণাঙ্গ সুগঠিত ও অপরূপ রূপমাধুর্য্যে বিকশিত হইয়াছে। সে দিনের সদ্যঃ উদ্গত সেই ক্ষুদ্র অঙ্কুরটিই আজিকার দিনের মহীরুহ। এ বটবৃক্ষের প্রধান কাণ্ড কাব্য, যাহা ক্রমশঃ নানা শাখাপ্রশাখায় বাহুবিস্তার করিয়া বহুরূপে প্রসারিত ও পরিব্যাপ্ত

হইয়া বঙ্গভারতীর এই ছায়াস্নিগ্ধনিবিড় স্নিগ্ধ পুণ্যোজ্জ্বল তপোবন রচনা করিয়াছে। কাজেই, বর্ত্তমান বাংলা কাব্যের আলোচনা করিতে হইলে, বাংলা কাব্যের ক্রমবিকাশ ও পরিণতির ইতিহাসও প্রাসঙ্গিক ভাবে আমাদের যে কিয়ৎ পরিমাণে আলোচ্য—তাহাতে বোধ হয় কাহারও কোনও সন্দেহ নাই।

আজ যে-ভাষাকে আমরা বাংলাভাষা মাতৃভাষা প্রভৃতি বলিয়া গৌরব করি, সুদূর অতীতের সেই সূতিকাগৃহে ইহার নাম অবশ্য বাংলা ছিল না। ইহা তখন সাধারণ ভাবে প্রাকৃতেরই গোষ্ঠীভুক্ত ছিল। খৃষ্টীয় ১৬শ, এমন কি, ১৭শ শতাব্দীতেও এ ভাষার নামকরণ হয় নাই, প্রাকৃত নামেই উল্লিখিত হইত।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালে "চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়ঃ", নামে একখানি বাংলা পুঁথি আবিষ্কার করেন। এখানি বৌদ্ধ সহজিয়া মতের একখানি খণ্ড কবিতা বা গানের বই। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এই গ্রন্থান্তর্গত পদগুলি ৯০০—৯৫০ কি ১০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত এবং এই গ্রন্থখানিই প্রাচীনতম বাংলা গ্রন্থ। ইহার পূর্ব্বেকার আর কোনও গ্রন্থ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

১০ম শতাব্দী

চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে ৩৩ জন পদকর্ত্তার রচনা আছে। ইহার ভাষা প্রাকৃত হইলেও, বাংলা ভাষার সেটি যে শিশুরূপ, তাহা সহজেই ধরা পড়ে। যাহাই হউক ভাষাতত্ত্বের বিশদ আলোচনা আমাদের অদ্যকার কর্ত্তব্যের বাহিরে।

চর্য্যাপদগুলির ছন্দ সব সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে সৃষ্ট। যথা—

কা আ তরু বর পঞ্চ বি ডাল

চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।

সংস্কৃত "পঙক্তি" ছন্দের গড়নে হ্রস্ব দীর্ঘ মিলাইয়া মোট ৮টি করিয়া স্বর এবং প্রত্যেক ৮ম স্বরশেষেই যতি। যথা—

কৃষ্ণসনাথা তর্ণকপঙক্তিঃ
যামুন কচ্ছে চারু চচার॥

সংস্কৃত উচ্চারণ আজন্ম স্বরধর্ম্মী। সংস্কৃতে হ্রস্ব সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্রই হ্রস্ব, এবং দীর্ঘ, দীর্ঘই। প্রাকৃতে তাহা নয়, বাংলাতেও নয়। এজন্য প্রাচীন বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে যে সব ছন্দ সৃষ্ট হইয়াছে, সেগুলি ছন্দানুযায়ী সুখশ্রাব্য ভাবে পড়িতে হইলে, রচনার হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, সেগুলিকে ছন্দের তালে বা ঝোঁকে পড়িতে হইবে। আর সেরূপ ভাবে পড়িতে গেলে উপলব্ধি হইবে যে, রচনার হ্রস্ব-দীর্ঘ মোটেই ধর্ত্তব্য নয়। ছন্দের খাতিরে প্রায়শঃই হ্রস্বকে দীর্ঘ এবং দীর্ঘকে হ্রস্ব করিয়া পড়িতে হয়। এরূপ না করিলেই যতিভঙ্গ হইবে। চর্য্যাপদেই এমন বহু উদাহরণ আছে। যেমন—

তুলি দুই পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তুলি কুম্ভীরে খাঅ।

এটিকে পঙক্তি ছন্দের খাতিরে পড়িতে হইলে এই ভাবে পড়িতে হইবে:

তুলি দুহি পীটা ধরণ ন জাঈ।
রুখের [হ্রস্ব এ] তেন্তুলি কুম্ভীরে [হ্রস্ব এ]
খা অ [দীর্ঘ অ]

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংস্কৃত ভাষা স্বরধর্ম্মী। কিন্তু বাংলা ভাষা তাহা নয়। বাংলায় শুদ্ধ বাণানঅনুযায়ী হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বর লিখিত হইলেও, দীর্ঘ বিশেষ উচ্চারণ হয় না, মোটামুটি সব স্বরেরই হ্রস্ব উচ্চারণ প্রচলিত:

স্রষ্টা দ্রষ্টা মন্ত্রদ্রষ্টা মানুষ ধরার—
স্রষ্টারি সৃষ্টিতে শুধু ভোগ-অধিকার।

সংস্কৃত ছন্দ হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের সমাবেশে যেমন সঙ্গীতময় ও ঝঙ্কারময় বাংলা ছন্দে হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণের চাল না থাকায়, হ্রস্বের স্থানে একটি এবং দীর্ঘের স্থানে দুইটি করিয়া অক্ষর বসাইয়া, বাংলা ছন্দের সৃজনারম্ভ হয় এবং এই ভাবে ক্রমশঃ বাংলা ছন্দ অক্ষরধর্ম্মী হইয়া পড়িয়াছে।

উদাহরণ স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত "পঙক্তি" ছন্দেরই বাংলা রূপ ধরা যাউক :—

সংস্কৃত : কৃষ্ণসনাথা তর্ণকপংক্তিঃ।

প্রাকৃত : তুলি তুহি পিটা ধরণ ন জাই।

বাংলায় : ঝর ঝর জল-ঝরা দরদর বরষায়

নাহি সাথী একাকীটি শুরু দেয়া গরজায়

অন্যরূপ :

থাক সব কর্ম্মেতে মূর্ত্তি সুমঙ্গল

অশরণে দাও আশা সান্ত্বনা সম্বল।

অন্যরূপ :

সৌধশিরে রক্তসিন্ধু পূর্ব্বাকাশে শরদিন্দু।

অতএব বাংলায় "পঙক্তি"র ৮টি স্বরবিশিষ্ট ছন্দের বাংলায় তিনটি রূপ দেখা যায় : প্রথমটিতে দীর্ঘ স্বর আছে, কিন্তু দীর্ঘ উচ্চারণ নাই— সবগুলিই যেন হ্রস্ব। আটটি অক্ষরে ৮টি স্বর। প্রত্যেক ৮ম অক্ষরের শেষে যতি।

দ্বিতীয় রূপে, ৮টি অক্ষর সব চরণে নাই বটে, তবে যুক্তাক্ষর-গুলিকে ২টি অক্ষর ধরিয়া, ৮টি স্বরে সম্পূর্ণ একএকটি চরণ গঠিত হইয়াছে। আধুনিক বাংলা ছন্দে যুক্তাক্ষরের এই ইন্দ্রজাল একটি অভিনব আবিষ্কার! যুক্তাক্ষরকে যেখানে দুইটি অক্ষররূপে পড়া হয়, সেখানেও ছন্দ কোথাও বাধে না :

থাকো সব্ করমেতে মূরতি সু-মঙ্ গল

অশরণে দাও আশা সান্ তনা সম্ বল্।

তৃতীয় রূপে, আমরা যুক্তাক্ষর পাইতেছি বটে, কিন্তু সেগুলিকে এক একটি অক্ষরের প্রতীক ধরিয়া, প্রথম উদাহরণের অসংযুক্ত অক্ষরের মতই এককরূপে গণনা করি।

এই জন্য আমার মনে হয়, বাংলা ছন্দগুলির কাঠাম সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণেই সৃষ্ট হইয়া, ক্রমশঃ অক্ষরধর্ম্মী হইয়া পড়িয়াছে, কারণ বাংলায় স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণের প্রথা নাই।

চর্য্যাপদগুলির মধ্যে আরও একটি ছন্দের সাক্ষাৎ মিলে :

| | || ||| | ‖ ! ! ‖
জাহি মন পবণ ন সঞ্চরই

|| || ‖ ‖ | ‖ |
রবি শশি নাহি পবেশ।

‖ | || ‖ ! | ‖ | |
তাহি বট চীঅ বিসামকর

| ! ‖ | | | | ‖|
সরহে কহি উব বেস ॥

এ ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় চরণে ১৪টি করিয়া স্বর আছে, ৮ম স্বর শেষে যতি। ২য় ও ৪র্থ চরণ ঠিক ১ম ও ৩য়-র মত নয়, কারণ প্রথম দিকে ৮ম অক্ষরে যতি ঠিক আছে, কিন্তু শেষার্দ্ধে ৬টির স্থানে মাত্র ৪টি স্বর। অবশ্য, অকারণে দীর্ঘ উচ্চারণ করিলে, ৪টিকে ছয়টি স্বরেও পরিণত করা যায়। ৪র্থ চরণে 'উব বেস' পদের 'বেস' ৪ মাত্রায় উচ্চারিত না হইলে ছন্দ মিলে না।

যাহাই হউক, এ ছন্দটির ১ম ও ৩য় চরণ সংস্কৃত "মণিমধ্য" ছন্দের অনুকরণে গঠিত :

মণিমধ্য ছন্দ :

কালিয় ভোগাভোগ গতঃ
তন্মণিমধ্য স্ফীত রুচা।
চিত্রপদা ভো নন্দসুতঃ
চারু ননর্ত্ত স্মেরমুখঃ ॥

এ ছন্দের ১ম অংশে ৮টি স্বর, ৮ম স্বর শেষে যতি এবং শেষাংশে ছয়টি স্বর, মোট ১৪টি স্বর।

"বসন্ততিলক" ছন্দে ১৪টি অক্ষর, যতি ৮ম অক্ষরের পর, স্বর সংখ্যা অবশ্য অনেক বেশী :

ফুল্লং বসন্ততিলকং তিলকং বনাল্যা
লীলাপরং পিককুলং কলমত্র রৌতি।
বাত্যেষ পুষ্পসুরভি মলয়াদ্রিবাতে
যাতো হরিঃ স মথুরাং বিধিনা হতাংস্ম॥

এখানে লক্ষণীয় এই যে, চতুর্দ্দশ স্বরের মণিমধ্য বা চতুর্দ্দশ অক্ষরের বসন্ততিলকই যে পরবর্ত্তী যুগের বাংলার নিজস্ব ছন্দ "পয়ার"-এর জনক, সে বিষয়ে বোধ হয় সকলেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন! বলা বাহুল্য, "পয়ার"ই বাংলার প্রথম ছন্দ। চর্য্যাপদগুলি ৯০০-১০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত বলিয়া পণ্ডিতগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। দশম শতাব্দীতেই বঙ্গভাষা ও কাব্যের শৈশবাবস্থার যে শেষ, তাহা মনে করিবার প্রকৃষ্ট কারণ পাওয়া যায়, ১১শ শতাব্দীর রচনায়।

১১শ শতাব্দীতে রচিত রামাই পণ্ডিতের "শূন্যপুরাণ"।

১১শ শতাব্দী

শূন্য পুরাণের ভাষা ও ছন্দের নমুনা :

আহ্মার বচনে গোসাঞি তুহ্মি চষ বাস।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবাস॥
পুখরী কাদায়ে লইব ভূম খানি।
আরসা হইলে জেন, চিচএ দিব পানি॥
আর সব কিসান কাঁদিব মাথে হাত দিআ।
পরম ইচ্ছা এ ধান্ন আনিব দাইআ॥
ঘরে ধান্ন থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুঃখ পাব॥

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত শূন্য পুরাণ।

প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে ইহার ভাষার উপর। এ ভাষায় প্রাকৃত শব্দ ও প্রভাব থাকিলেও, ইহার ক্রিয়া বিভক্তি এবং শব্দগুলি, চর্য্যাপদের ক্রিয়া বিভক্তি এবং শব্দ হইতে বাংলার ঢের নিকটতর। তদুপরি ইহার পয়ার ছন্দ। পয়ারে সর্ব্বত্র ১৪ অক্ষরের সাম্য না থাকিলেও, ইহাকে আমরা প্রথম বাংলা পয়ার বলিয়া শুভ স্বাগত জানাইতেছি।

সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মীয় জাতীয় ও সামাজিক অবস্থা ব্যবস্থা রীতিনীতি সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করিয়াই যুগে যুগে দেশে দেশে সাহিত্য গড়িয়া উঠে। যদিও আসল বুদ্ধকথা লিখিত হইত পালিতে, তথাপি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সৃজন হইয়াছিল বৌদ্ধ মতবাদের আওতায়। বাংলা সাহিত্যে সেজন্য প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের কথা কিছুই লিখিত হয় নাই, যাহা হইয়াছে তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের নিকৃষ্ট ও বিকৃত রূপ এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মান্তর্গত শূন্যবাদ মাত্র।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন স্যাং ভারত পর্য্যটন করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের কথায় লিখিয়াছেন—আর্য্যাবর্ত্তে তখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইলেও বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব ছিল প্রভুত।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—বঙ্গদেশের হাড়ী ডোম কাপালী প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরাই বিকৃত বৌদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্বে আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মপূজার প্রচলন করে। এ ধর্ম্মপূজা শূন্যবাদেরই নামান্তর। বঙ্গদেশে ধর্ম্মপূজার প্রবর্ত্তক শূন্যপুরাণ-রচয়িতা রামাই পণ্ডিত, জাতিতে ডোম ছিলেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেন, খৃষ্টীয় ৮০০—১২০০ অব্দের মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাবের বিলোপ এবং হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়।

হর্ণলি-ও বলেন—৮০০—১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রাকৃত ভাষার আধিপত্য লোপ এবং গৌড়ীয় ভাষাগুলির অভ্যুত্থান।

১১শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত বাংলায় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পাল রাজগণ রাজত্ব করিলেও, বাংলার উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা বৌদ্ধধর্ম্ম বা পালি ভাষা ও সাহিত্যে মোটেই আকৃষ্ট হন নাই। ইঁহারা হিন্দুই ছিলেন এবং সংস্কৃতেরই চর্চ্চা করিতেন! বীম্‌স বলেন—অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা সংস্কৃতের সমধিক নিকটবর্ত্তী। প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলেন, বাংলা মারাঠী ও উড়িয়ায় তৎসম শব্দের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, কিন্তু হিন্দি, গুজরাতী, পাঞ্জাবী ও সিন্ধিতে নিতান্ত কম।—Comparative Grammar Vol 1., P 29.

১১শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পালবংশের বিলোপের সঙ্গে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের যে সামান্য চিহ্নও অবশিষ্ট ছিল, তাহাও বিলুপ্ত হইল।

১১শ শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সেন রাজগণ বাংলা দেশের শাসন ভার গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে "নাথ" সম্প্রদায় নামে এক অভিনব ধর্ম্মমত গড়িয়া উঠে। নাথ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক গোরক্ষ-নাথ। ইনি পাঞ্জাবের অধিবাসী হইলেও, ইঁহার কর্ম্মভূমি ছিল বাংলায়। দীনেশবাবু বলেন, এই সাধু গোরক্ষনাথই ময়নামতীর স্বামী রাজা মাণিকচাঁদের গুরু ছিলেন।

নাথধর্ম্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ "গোরক্ষবিজয়" ১২শ শতাব্দীর রচনা! দীনেশবাবুর মতে—"গোরক্ষবিজয় ছড়ার মত দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গীয় গ্রাম্য সাহিত্যের এক কোণে পড়িয়া ছিল, ফয়জুল্লা প্রভৃতি লেখকগণ হয়ত পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দীতে তাহা কুড়াইয়া লইয়া সেগুলিকে কাব্যে পরিণত করিয়াছেন। সেই প্রাচীন দ্বাদশ শতাব্দীর রচনার অনেকাংশ এখনও ইহাতে বিদ্যমান।"—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ৬০।

১২শ শতাব্দী

দ্বাদশ শতাব্দীতে আমরা বাংলা কাব্যের বাল্য রূপের প্রায় সীমান্তে আসিয়া, দেখি—

ঠগের হাতেত গুরু সঁপিলা ভাণ্ডার।
চাঙ্গাতির হাতে ভরা সঁপিলা তোমার॥
মাছের প্রহরী দিলা দারুণ যে উদ।
বিরাল প্রহরী দিল ঘন আণ্ডটা দুদ॥
মহাতেজ কুড়ালেতে সমর্পিলা তরু।
ব্যাঘ্রের সম্মুখে তুমি সমর্পিলা গোরু॥
দরিদ্রেতে খুলে তুমি অমূল্য রতন।
কাঠের উপরে যেন অগ্নির স্থাবন॥

—ফয়জুল্লার গোরক্ষবিজয়।

এখানে আমরা আধুনিক বাংলার রূপই পাইতেছি, আর পাইতেছি নির্দ্দোষ পয়ার রচনা।

গোরক্ষবিজয়ের ভাষা ও ছন্দে যে পারিপাট্য লক্ষিত হয়, তদানীন্তন কালের ময়নামতীর গানে বা মাণিকচাঁদের গানে কিন্তু সেরূপ দৃষ্ট হয় না :

বান্দিলাম বাংলা ঘর নাই পাড় কালী।
এমন বয়সে ছাড়ি যাও আমার বৃথা গাবুরালী॥
নিন্দের স্বপনে রাজা হব দরিসন।
পালঙ্গে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন॥
দশ গিরির মাও বহিন রবে স্বামি লইবে কোলে
আমি নারী রোদন করিব খালি ঘর মন্দিরে॥
পিপাসার কালে দিমু পানী।
হাসিয়া খেলিয়া পোহামু রজনী॥

গ্রীয়ার্সন সংগৃহীত, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃঃ ৫৬

ইহার ভাষা বাংলা এবং প্রাকৃতবর্জ্জিত হইলেও, ছন্দোবন্ধনে বিশেষ শৈথিল্য দেখা যায়। এটিকে সেজন্য পয়ার না বলিয়া, ছড়া বলিলেই বোধ হয় সুষ্ঠু হয়। কারণ ডাক ও খনার বচন নামে ছড়ায়

রচিত যে সব বচন অদ্যাপি প্রচলিত, সেগুলিও এই ৮০০—১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই রচিত বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন।

ডাকের বচন:

পৌষে যাহার নাহিক ভাত
তার কভু নাহিক সোয়াথ।

গঙ্গা লিড়ান বাঁধন আলি
পরে দিও নানান শালি।

আদি অন্ত ভুঞ্জসি।
ইষ্ট দেবতা যেহ পূজসি॥
মরণের যদি ডর বাসসি।
অসম্ভব কভু না করিসি॥

খনার বচন:

খনা বলে ডেকে আন
রোদে ধান ছায়ায় পান।

জ্যৈষ্ঠে খরা আষাঢ়ে ধারা
শস্যের ভার সয় না ধরা।

*   *

দাতার নারিকেল বখিলের বাঁশ
কমে না বাড়ে না বারমাস।

১২শ শতাব্দীর মধ্যে এগুলি রচিত ; কিন্তু ভাষার যে আধুনিক রূপ দেখা যায়, হয়ত লোকের মুখে মুখে চলিতে চলিতে এই দীর্ঘ কালে, তাহার কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ভাষার পরিবর্ত্তন সম্ভব, কিন্তু ছন্দের পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়। অথচ এগুলি পয়ারও নয়, বরং পয়ারের অংশ বলা চলে। এগুলি ছড়া নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, আমরাও এগুলিকে ছড়াই বলিব। মাণিকচাঁদের বা ময়নামতীর গানও এই ছড়া জাতীয়, কারণ পয়ারের নিয়ম কোথাও বিশেষ অনুসৃত হয় নাই।

এ ছড়ার ছন্দেও তৎকালের অজ্ঞাত এবং অনাগত এক বৃহৎ সম্ভাবনা লুক্কায়িত ছিল।

ছড়াতে আমরা দুইটি রত্নের সন্ধান পাই। একটি ছন্দে হসন্ত বর্ণের সদ্ব্যবহার এবং অপরটি অক্ষর সংখ্যার উপর নির্ভর না করিয়াও ছড়ার ছন্দে শ্রুখশ্রাব্য পয়ারাদি বিবিধ ছন্দ রচনা। বর্ত্তমান বাংলা কাব্য-সাহিত্যে মাত্রাবৃত্ত বা মাত্রিক ছন্দের যে প্রাচুর্য্য এবং সম্পূর্ণ রূপ দেখি, এই যুগেই এবং ছড়াকে আশ্রয় করিয়াই তাহার যে শুভ সূচনা সংঘটিত হইয়াছে, ইহা জোর করিয়াই বলা চলে।

ছড়ার এই মাত্রাবৃত্ত ছন্দ আমরা প্রচুর পরিমাণে পাই প্রাচীন ব্রতকথা এবং রূপকথায়। দীনেশ বাবুর মতে—"বাঙ্গলার কতকগুলি নিজস্ব ব্রতকথা ও রূপকথা আছে, যাহা বহু প্রাচীন। * * * সেগুলি কত প্রাচীন তৎসম্বন্ধে কোন ঠিক সংবাদ দিতে না পারিলেও আমরা দেখাইব, যে-যুগে বাঙ্গালী ডিঙ্গা বহর বাঁধিয়া সমুদ্রে গমনাগমন করিত ; যে-যুগে সাধু বা বণিকের এ দেশে রাজসম্মান ছিল ; যে-যুগে রাম লক্ষ্মণ প্রহ্লাদ ধ্রুব প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্রগুলি এ দেশের কল্পনা মুগ্ধ করে নাই * * * পৌরাণিক ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং বৌদ্ধশক্তির পরিণতির সেই যুগে এই সমস্ত গ্রাম্য কথা রচিত হইয়াছিল।"—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ ৬৬।

দীনেশবাবুর কথামত এই ব্রত ও রূপকথাগুলি তাহা হইলে ৮০০—১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই রচিত। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ের সঙ্কলিত শঙ্খমালা, কাঞ্চনমালা প্রভৃতি গল্পগুলিতে আমরা দেখি উক্ত সব ছড়ার মধ্য দিয়া বাংলার কথা-সাহিত্যেরও শুভাগমন ঘটিয়াছে।

১২শ শতাব্দীর শেষে মহাকবি জয়দেব গোস্বামীর আবির্ভাব হয়। তাঁহার "গীতগোবিন্দম্" কাব্য শুধু সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যেই একখানি অমর উপায়ন নয়, বাংলার কাব্যমণ্ডলও গীতগোবিন্দের প্রভাবে সবিশেষ প্রভাবিত। গীতগোবিন্দের ভাষা ভাব ব্যঞ্জনা অনুপ্রাস এমন কি ছন্দ পর্য্যন্ত বাংলা কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

১২০৩ খৃষ্টাব্দে সেন রাজত্ব শেষ হইয়া বঙ্গদেশে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সেন রাজত্বকালে নবজাগ্রত হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির যে পুনরুত্থান ঘটিয়াছিল, হঠাৎ রাষ্ট্রপরিবর্ত্তনে এবং বিদেশীর রাজ্যভার গ্রহণে, তাহা যথেষ্ট পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হইল। দেশব্যাপী একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। এই নূতন নরপতিগণ প্রথমে দেশে ইসলামধর্ম্ম বিস্তারে মনোনিবেশ করায়, বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। দেশের রাজধর্ম্মের সঙ্গে দেশের লোকের চিরাচরিত ধর্ম্মের সংস্কৃতিমূলক এক দারুণ বিরোধ বাধিল। রাজশক্তির এই দুর্ণিবার স্রোতকে প্রতিহত করিয়া, হিন্দুর ধর্ম্ম সভ্যতা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে ও হিন্দু ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিতে, হিন্দুসমাজও বদ্ধপরিকর হইল। তাহার ফলে, হিন্দুসমাজের সমবেত চেষ্টায় অগ্নি বায়ু কালিকা গরুড় প্রভৃতি পুরাণগুলি বঙ্গভাষায় অতি দ্রুত অনূদিত হইল। কথকতা পাঁচালী ও গীতাদির দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থগুলিকে জনগণের মধ্যে প্রচারিত করা হইতে

১৩শ শতাব্দী

লাগিল। এবং জনসাধারণের মঙ্গলসাধনের জন্য লক্ষ্মীমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, সূর্য্যের পাঁচালী প্রভৃতি বহু লৌকিক দেবতাকে উপলক্ষ্য করিয়া বহু মঙ্গল-কাব্যেরও সৃষ্টি হইল।

যুগে যুগে দেশে দেশে ধর্ম্মবিপ্লবে সাহিত্যের রূপ এবং রুচির পরিবর্ত্তন ঘটে। রোম্যান্ ধর্ম্মযাজকদের প্রতিপত্তিবিলোপের সঙ্গে সঙ্গে ল্যাটিন ভাষার আধিপত্য বিনষ্ট হয়। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পাল রাজগণের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্ম, এবং পালি ও প্রাকৃত ভাষার প্রসারও রুদ্ধ হয়। হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী সেন রাজগণের অভ্যুদয়ে ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম ও সংস্কৃত ভাষার পুনরুত্থান ঘটে। তাহার পর দেশের রাজধর্ম্ম ইসলাম হওয়ায়, হিন্দুধর্ম্মের কাঠামটি কোনও প্রকারে রক্ষা করিবার জন্য, হিন্দুরা সংস্কৃত ভাষা ছাড়িয়া সর্ব্বজনবোধ্য বাংলা ভাষায় তাঁহাদের প্রচার কার্য্য চালাইতে বাধ্য হইলেন।

এই স্থলে একটি বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইতে হইবে। এতকাল কেবল বৌদ্ধ ও নাথ সম্প্রদায়ের কথা লইয়াই বাংলা সাহিত্য বাঁচিয়া ছিল। এই দুই সম্প্রদায়ের কাহিনী বর্ণনা ছাড়া, ডাকের বচন খনার বচন ব্রতকথা ও রূপকথা প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড বিষয় বাংলা সাহিত্যের অতি নগণ্য অংশই অধিকার করিয়া ছিল। হিন্দুধর্ম্মের কোনও গ্রন্থ এতদিনের মধ্যেও বাংলায় রচিত হয় নাই, তাহার কারণ, মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে গৌড়ে বাংলা ভাষা ছিল অপাংক্তেয়, যদিও জনসাধারণের মুখের ভাষাই ছিল বাংলা। বাংলা ভাষায় তখন হিন্দুধর্ম্মের কোনও গ্রন্থ অনুবাদ কি রচনা করা ছিল মহাপাপের কার্য্য। পণ্ডিতগণ এই বাংলা লেখকরূপ মহাপাপীদের জন্য রৌরব নরকের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন :

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥

তখনও বাংলাভাষাকে বাংলাই কেহ বলিত না; প্রাকৃত নামেই বাংলা ভাষা প্রচলিত ছিল। ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতেও বাংলাভাষাকে প্রাকৃত বলা হইত :

তাহা অনুসারে লিখি প্রাকৃত কথনে —কৃষ্ণকর্ণামৃত
প্রাকৃত লিখিয়া বুঝি এই মোর সাধ —যদুনন্দন দাসের গোবিন্দলীলামৃত
প্রাকৃতপ্রসঙ্গে কহি শুন সর্ব্বলোক— লোচনদাসের চৈ, ম, মধ্য—
প্রাকৃত শব্দেও যেবা বলিবেক আই —চৈ, ভা, মধ্য

খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতেও বাংলা ভাষা লৌকিক অর্থাৎ প্রাকৃতভাষা নামেই প্রখ্যাত ছিল :

লৌকিক ভাষায় মুক্তি করিয়ু লিখনে —প্রেমদাস ওরফে যদুনন্দন দাসের বংশীশিক্ষা

উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদিগের নিকট বঙ্গভাষার ত এই সম্মান !!! কিন্তু আপৎকালে তাঁহারা সাময়িকভাবে সে বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া বাংলা-ভাষাকেই তাঁহাদের প্রচারের একমাত্র বাহন স্বীকার করিয়া, বাংলা-ভাষাকে তাহার ন্যায্য সম্মান দিতে তাঁহারা বাধ্য হইয়াছিলেন।

১২৮৫-১৩২৫ খৃঃ পর্য্যন্ত গৌড়ের রাজসিংহাসনে ছিলেন নসীর খাঁ সাহেব। এই মহানুভব নরপতিই সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করাইয়া এবং বাঙালী লেখকদিগকে বাংলা রচনায় উৎসাহ দিয়া যে মহৎ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেন, উত্তর কালে তাঁহার সুযোগ্য বংশধরেরাও সে আদর্শকে চিরদিন মহিমান্বিত করিয়াই রাখিয়া গিয়াছেন। এ জন্য নসীর খাঁ সাহেব বঙ্গসাহিত্যের একজন স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তি।

যে-বঙ্গভাষা হিন্দু ভূম্যধিকারী ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের হাতে উন্নত হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিন উপেক্ষিত ও অপমানিতই হইয়া আসিয়াছে, সেই দীনা বঙ্গভাষা আজ বিদেশী মুসলমান নরপতির হস্তে অসামান্য অনুগ্রহ লাভ করিয়া রাজসম্মানে গৌরবান্বিত হইল। সে দিন এই রাজানুগ্রহ

লাভ না করিলে বঙ্গভারতী যে আজ কোথায় কি অবস্থায় থাকিতেন, তাহা কল্পনার অতীত।

গৌড়েশ্বর নসীর শাহের সময়েই মহাভারতের প্রথম বাংলা অনুবাদ হয়। নসীর শাহের কাব্যরসবোধ সম্বন্ধে তাঁহার সম-সাময়িক কবি বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

> সে যে নসীর শাহ জানে
> যারে হানিল মদন বাণে।
> *   *   *
> চিরঞ্জীব রহুঁ পঞ্চ গৌড়েশ্বর
> কবি বিদ্যাপতি ভনে॥ —প-ক-ত ২১১,

নসীরশাহের অনুসরণে অন্যান্য মুসলমান নরপতি ও ভূম্যধিকারীগণও বহু কবিকে সসম্মানে তাঁহাদের রাজসভায় স্থান দিয়া অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

গৌড়েশ্বর নসীর খাঁ প্রমুখ মুসলমান রাজন্যবর্গের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ক্রমশঃ হিন্দু ভূম্যধিকারী ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরাও বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী হইয়া উঠিলেন।

প্রথম শাসনভার লইয়াই যে-মুসল্‌মান নৃপতিগণ হিন্দুর ধর্ম্ম সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য দুরন্ত অভিযান চালাইয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার হিন্দুর ধর্ম্ম, সাহিত্য, দর্শন, পুরাণ ও সভ্যতার গ্রন্থগুলিকে অনুবাদ করাইয়া, সর্ব্বসাধারণ্যে প্রচার করাইয়া, হিন্দুর প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য রাজকোষ পর্য্যন্ত মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। গৌড়ের মুসল্‌মান নরপতিগণের নিকট সে জন্য বঙ্গসাহিত্যের ঋণ অপরিশোধ্য।

ইতিহাস যুগে যুগে পুনরাবৃত্ত হয়। ইংরাজ-শাসনের প্রথমে ইংরাজ পাদ্রীগণ বঙ্গভাষায় উন্নতি ও প্রসারকল্পে যাহা করিয়াছেন,

কোনও বাঙ্গালীই তাহা করেন নাই বা করিতেও পারিতেন না। রেভাঃ লং কেরি মার্শম্যান প্রমুখ ইংরাজ পাদ্রীগণও এই জন্য বাঙালীর চিরস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক।

১৪শ শতাব্দী

১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলায় তিনজন অমর কবির আবির্ভাব হইল: ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস, মিথিলায় বিদ্যাপতি, ও নান্নুরে চণ্ডীদাস। বলা বাহুল্য, মিথিলা তখন বঙ্গদেশের পশ্চিমসীমান্ত ছিল।

জনগণকল্যাণে লোকশিক্ষার উপযোগী করিয়া বাল্মীকির রামায়ণের অনুধ্যানে কৃত্তিবাস বাঙালীর মনের মত করিয়া যে রামায়ণ রচনা করিয়া গিয়াছেন, আজ ৬০০ বৎসরেও তাহার মাধুর্য্য রসবস্তু ও প্রতিপত্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। বাল্মীকির রামায়ণ অনেকে হয়ত চোখেও দেখে নাই, কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়ে নাই এমন বাঙালী খুবই কম।

বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত অবলম্বনে বৈষ্ণব-সাহিত্য তথা খাঁটি প্রেমকাব্যের যুগল বাল্মীকি—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। ইঁহাদের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ-রাধাকে লইয়া কোনও কাব্য রচনা দূরে থাকুক, বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতা বা গানও কেহ রচনা করেন নাই। ইঁহাদের প্রেমের কবিতার তুলনা বিশ্বসাহিত্যেও মিলে না।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ভাবে বাংলার কাব্যসাহিত্য বহুল পরিমাণে অনুভাবিত ও অনুপ্রাণিত। পরবর্ত্তী যুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহা-মানবতার ছায়াবীথিতলে অগণিত পদকর্ত্তা আবির্ভূত হইয়া যে বিপুল পদাবলী-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও এই দুই কবিরই উত্তরসাধক। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পরম অনুরাগী ভক্ত ছিলেন।

এখানে আমরা দেখিতেছি, গত ১০ম হইতে বর্ত্তমান ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত, এই ৪০০ বৎসরে, আমরা যে-সব কাব্য পাইয়াছি, সেগুলি কোন

না কোনও ধর্ম্মমতকে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে এবং সেইদিকে জনমত গঠন করিবার জন্যই রচিত। কাব্যের জন্য কাব্যরচনা, অমিশ্র রস পরিবেশনের জন্য রসসৃষ্টি, বা সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত সাহিত্যরচনা, এ যাবৎ রচিত কোন রচনার সম্বন্ধেই বলা চলে না, কৃত্তিবাসের রামায়ণকেও না। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কাব্য সেই গড্ডালিকাপ্রবাহের ধারা ভাঙিয়া দিয়া, এক অভিনব ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীর নির্দ্দেশ দিল, যাহা পরবর্ত্তী যুগের পদাবলী-সাহিত্যে শত শত দলে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস দুইজনেই সমসাময়িক এবং একই ভাবে অনুভাবিত হইলেও, দুই জনের রসধারা দুইটি বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত।

বিদ্যাপতি সুখের কবি, মিলনের আনন্দের ও পুলকের কথাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। চণ্ডীদাস ঠিক বিপরীত; তিনি ছিলেন দুঃখবাদী; বিরহব্যথাই তাঁহার কাব্যের প্রাণ; বেদনাই তাঁহার কাব্যকে অমৃতময় করিয়াছে; দুঃখকে তিনি প্রেমেরই এক অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া জানিতেন :

> কহে চণ্ডিদাস শুন বিনোদিনী
> সুখ দুঃখ দুটি ভাই
> সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
> দুঃখ যায় তার ঠাঁই।
>
> *　　*　　*
>
> পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
> পিরীতি মিলয়ে তথা।

চণ্ডীদাসের কাব্য—সহজ মানবমনের স্বাভাবিকতায় ও সরলতায় সাবলীল ও বেগবান।

সই কেমনে ধরিব হিয়া
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙিনা দিয়া।
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া
এমতি করিল কে ?
আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমতি হউক সে।

এমন সরল স্বাভাবিক অথচ তীব্র মনোবেদনা বর্ণনা, জগতের সাহিত্য-ভাণ্ডারে আর কোথায় আছে, জানি না।

চণ্ডীদাসের আর এক স্বাতন্ত্র্য—তিনি মানুষের কবি। মানুষকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন, পূজা করিতেন এবং দেবতারও উপরে মানুষকে স্থান দিতেন :

শুনরে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

মানুষের এমন প্রশস্তি অদ্যাবধি আর কোনও কবি রচনা করেন নাই।

চণ্ডীদাসের কাব্য প্রিয়তমের বিরহে কুটীরবাসিনীর একান্তে নীরব মৌন অশ্রুবর্ষণ; আর বিদ্যাপতির কাব্য ঐশ্বর্য্যভারাবনম্রা প্রাসাদ-পুরাঙ্গনার মিলনোৎসব এবং কচিৎ বিনাইয়া বিনাইয়া শুনাইয়া শুনাইয়া বিলাপগীতা। বিদ্যাপতির কাব্য অলঙ্কারে ঐশ্বর্য্যময়, ছন্দের মাধুর্য্যে উৎসবময় এবং ব্যঞ্জনার গৌরবে সঙ্গীতময়। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রেমিকচিত্তের সহজ ভাষায় ভাবসমৃদ্ধ, ব্যঞ্জনার স্বাভাবিকত্বে রস-গভীর এবং গঙ্গোত্রীধারার মত স্বতঃস্ফূর্ত্ত সাবলীল প্রবাহে বেগবান চিরন্তন ও সার্ব্বজনীন।

কি বিরহে কি মিলনে বিদ্যাপতির পদ কাব্যালঙ্কারে পরম ঐশ্বর্য্যশালিনী।

বিরহে :

সখি হে হমর দুখক নাহি ওর
ত ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন মন্দির মোর ॥
ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরসন্তিয়া
কান্ত পাহুন কাম দারুন
সঘনে খর সর হন্তিয়া।
কুলিস কত সত পাত মুদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুর ডাক ডাহুক
ফাটি যায়ত ছাতিয়া ॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া
বিদ্যাপতি কহ কইসে গমাওব
হরি বিনু দিন রাতিয়া॥

মিলনে :

সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বান অব লাখ বান হউ
মলয় পবন বহু মন্দা।

* * *

অন্যত্রে :

জনম অবধি হম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সেহো মধু বোল শ্রবনহি শূনল
শ্রুতিপথ পরস ন ভেল।

কত মধু যামিনী রভস গমাওলুঁ
ন বুঝলুঁ কৈসন কেল।
লাখ লাখ জুগ হিঅ হিঅ রাখলুঁ
তবু হিঅ জুড়ন ন গেল॥
কত বিদগধ জন রস অনুমোদই
অনুভব কাহু ন পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াএত
লাখে ন মিলল এক॥

বিদ্যাপতির ছন্দ প্রাচীন প্রাকৃতের অনুযায়ী স্বরধর্ম্মী, যদিও স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ কোথাও অনুসৃত হয় নাই। বিদ্যাপতির ছন্দও ছন্দের নিজস্ব ঝোঁকেই পড়িতে হয়।

চণ্ডীদাসের পদাবলীতে "পঙক্তি" হইতে উদ্ভূত অষ্টাক্ষরী ছন্দ, লঘু-ত্রিপদী ও একাবলীর দর্শন পাই। এ ছন্দগুলি এখন বাংলার নিজস্ব ছন্দ হইয়া গিয়াছে।

১৫শ শতাব্দী

১৫শ শতাব্দীতে গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের রাজত্বকালে তাঁহার আনুকূল্যে বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণদেব পদ্মাপুরাণ এবং দ্বিজ জনার্দ্দন মঙ্গলচণ্ডী রচনা করেন। অনুবাদও এ সময়ে বড় কম হয় নাই। কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত, শ্রীকরণ নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্ব এবং দ্বিজ অনন্তরাম রামায়ণ অনুবাদ করেন।

হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ ও তাঁহার পুত্র ছুটিখাঁও বাংলা সাহিত্যপ্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে গৌড়েশ্বরের আদেশে মালাধর বসু "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" নামে শ্রীমদ্‌ভাগবতের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া গুণরাজ খাঁ উপাধিতে বিভূষিত হন।

১৫শ শতাব্দীতে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ হইয়াছে, কিন্তু মঙ্গলকাব্য রচনা বন্ধ হয় নাই। এ শতকে রূপরাম, প্রভুরাম, দ্বিজ

রামচন্দ্র, শ্যামল পণ্ডিত, মাণিক গাঙ্গুলী প্রভৃতি কয়েক জন কবি এক একখানি করিয়া ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়াছেন।

১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে আর একজন শক্তিমান কবির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ইনি কাশীরাম দাস। ইনিও কৃত্তিবাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, বেদব্যাসের মূল মহাভারত অবলম্বনে জনগণের সহজবোধ্য করিয়া এক মহাভারত রচনা করেন। মহাভারতের বহু অনুবাদের মধ্যে কাশীরাম দাসের মহাভারত সত্যসত্যই অমৃতসমান। এই গ্রন্থখানি বঙ্গদেশে অদ্যাপি জনপ্রিয় এবং বহুলপঠিত।

১৬শ শতাব্দী

১৬শ শতাব্দী বঙ্গ-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। ১৫শ শতাব্দীতে অর্থাৎ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভুর জন্ম হইলেও, ১৬শ শতাব্দীতে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যে বিপুল ধর্ম্ম দর্শন জীবনী অনুবাদ কাব্য নাটক ও পদাবলীসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেরূপ ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও ঘটে নাই ; ইহার পরে তিন শতাব্দীর মধ্যেও এমন হয় নাই।

শ্রীচৈতন্যপ্রভাবিত এই নবীন বৈষ্ণবসমাজে দেখিতে দেখিতে অসংখ্য পদাবলী ও অগণ্য পদকর্ত্তার আবির্ভাব ঘটিল। পদকল্পতরুতে তৎকালীন ২০০ পদকর্ত্তার প্রায় সাড়ে তিন হাজার পদের সন্ধান মিলে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, যাহা সন্ধান হইয়াছে তদপেক্ষা ঢের বেশী বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই পদকর্ত্তাদের মধ্যে কয়েকজন মুসলমান কবিরও নাম পাওয়া যায় : আকবর, আকবর শাহ আলি, কবীর, কামরালি, নসীর মামুদ, ফকীর হবিব, ফতন, শালবেগ, শেখ জালাল, শেখ ভিক, শেখ লাল, সৈয়দ মর্ত্তুজা প্রভৃতি। এই পদাবলীসাহিত্যে পদকর্ত্রীরূপে কয়েকজন নারীর নামও পাওয়া যায় : রসময়ী দাসী, মাধবী দাসী, রামী প্রভৃতি। বঙ্গ-ভাষায় প্রকৃতপক্ষে ইহারাই সর্ব্বপ্রথম মহিলা কবি। চৈতন্যযুগে বাংলা সাহিত্যে একটি অভিনব সম্পদ বাড়িয়াছে, জীবনীসাহিত্য। বলা বাহুল্য, এ জীবনীগুলিও কাব্যে রচিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লোকোত্তর জীবন ও চরিত্র বহু লোকের প্রাণে কবিত্বের উৎসমুখ খুলিয়া দিয়াছিল বলিয়া, একই সময়ে এতগুলি কবি এই মহিমাময় জীবনচরিত রচনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকথার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনেক পার্ষদের জীবনী পর্য্যন্তও রচিত হইয়াছিল। এই জীবনীসাহিত্যের মধ্যে—যদুনন্দনদাসের কর্ণানন্দ, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, গোবিন্দ দাসের কড়চা, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, বৃন্দাবনদাসের নিত্যানন্দ বংশাবলী, শ্যামদাসের অদ্বৈতমঙ্গল, ঈশাননাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ, লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের অদ্বৈতের বাল্যলীলাসূত্র, নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তি রত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, শ্রীনিবাসচরিত ও গৌরচরিতচিন্তামণি, নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস, নরহরি দাসের অদ্বৈতবিলাস, লোকনাথ দাসের সীতাচরিত্র [সীতাদেবী ছিলেন অদ্বৈত গোস্বামীর পত্নী,] রসিকানন্দের রসিকমঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থগুলিই সমধিক প্রসিদ্ধ।

নিয়তচঞ্চল কালের চক্রনেমি চির অস্থির, কোথাও সে স্থির হইয়া থাকে না। ঊর্দ্ধ আর ঊর্দ্ধে রহিল না, ক্রমশঃ নিম্নে নামিয়া আসিল। যে-শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করিয়া চৈতন্যযুগের অসামান্য মহিমা সহস্রদলে, বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মহামানবের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে দিগ্‌দিগন্ত অন্ধকার করিয়া কালির অক্ষরে তাঁহার বিদায়বার্ত্তা রটিয়া গেল, অপূর্ব্ব এই গৌরবের মহাসমারোহখানি অবিলম্বে পরিম্লান হইয়া উঠিল, যে-কাব্যমন্দাকিনী শতপথে প্রবাহিত হইয়া রাঢ়বঙ্গকে পরিপ্লাবিত করিয়া তুলিয়াছিল, সে স্রোতধারাও অকস্মাৎ মধ্যপথে শুকাইয়া গেল।

বৈষ্ণবধর্ম্ম পথভ্রষ্ট হইল, কিন্তু বৈষ্ণবসাহিত্য রহিয়া গেল। ঘনায়মান তমসায় মৃদুবিকম্পিত দীপশিখার মত লৌকিক দেবদেবীগণ আবার আস্তে আস্তে জনগণমনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র শিবঠাকুরকে জনসমাজে চালাইবার জন্য "শিবায়ন" লিখিলেন; কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ "মনসার ভাসান" রচনা করিলেন; এবং সীতারাম "ধর্ম্মমঙ্গল" ও রামদাস আদক "অনাদিমঙ্গল" লিখিয়া জনকল্যাণসাধন করিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। এই শতাব্দীর শেষভাগে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কন "চণ্ডী" রচনা করেন। এই চণ্ডীই এ যুগের একমাত্র উল্লেখযোগ্য কাব্য।

১৭শ শতাব্দী

১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি কবি আলাওল "পদ্মাবতী" কাব্য অনুবাদ করেন। পদ্মাবতী চিতোরের মহারাণী পদ্মিনীর উপাখ্যান। জনৈক সাধু মালিক মহম্মদ "পদ্মাবৎ" নামে হিন্দি ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করেন, আলাওল বাংলায় তাহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। এতদিন কেবল সংস্কৃত হইতেই বাংলায় অনুবাদ হইয়া আসিতেছিল, হিন্দির বাংলা অনুবাদ এই প্রথম হইল।

এ শতাব্দীতে ঘনরাম চক্রবর্ত্তী "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল" নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। ইনি সত্যনারায়ণের পাঁচালীও একখানি লিখিয়াছিলেন। সহদেব চক্রবর্ত্তীও এই সময়ে আর একখানি "ধর্ম্মমঙ্গল" রচনা করেন।

১৭শ শতাব্দীতে বঙ্গসাহিত্যে ঘোর অজন্মা দেখা যায়। এ যাবৎ কবিদিগের কাব্যকণ্ডূতি ধর্ম্মমঙ্গল রচনাতেই সাধারণতঃ, এবং ক্বচিৎ মনসা, শিব, সূর্য্য প্রভৃতি কোনও একটি লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াই শান্ত হইয়াছে। প্রায় দুই শত ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থের এখনও সন্ধান পাওয়া যায়, হয় ত বহু বিলুপ্তও হইয়াছে। কাজেই আমার মনে হয়, নবীন কবিগণ লিখিবার বিষয়বস্তুর অভাবেই বোধ হয়, এ যুগে তেমন কিছু লিখেন নাই।

শ্রীচৈতন্যপ্রভাবিত ১৬শ শতাব্দীতে অতি-জন্মার ফলে, ১৭শ শতাব্দীর অজন্মা খুবই স্বাভাবিক। সেজন্য ১৮শ শতাব্দীর শুভ প্রভাতেই

আবার বাংলার কাব্যগগনে দুইটি সমুজ্জল জ্যোতিষ্ক দেখা দিল।

১৮শ শতাব্দী

১৭০২ খৃষ্টাব্দে, কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর এবং ১৭২০ খৃষ্টাব্দে সাধকপ্রবর কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন।

ভারতচন্দ্রের সুবিখ্যাত কাব্য "অন্নদামঙ্গল"। "বিদ্যাসুন্দরের" কাহিনীও এই অন্নদামঙ্গলেরই অন্তর্গত। অন্নদামঙ্গল প্রাচীন মঙ্গল কাব্যগুলিরই অনুকরণে অন্নদার মাহাত্ম্য বর্ণনায় পূর্ণ হইলেও, সমগ্র মঙ্গলকাব্যের মধ্যে এইখানিই শ্রেষ্ঠ এবং বঙ্গকাব্যমঞ্জুষায় একখানি অমূল্য রত্ন। যতদিন বঙ্গসাহিত্য থাকিবে, ততদিন হিমালয়ের কালজয়ী অভ্রভেদী চূড়ার মত ভারতচন্দ্র ও তাঁহার অন্নদামঙ্গল কাব্যও মহামহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ব্যতীত, ভারতচন্দ্রের মত প্রতিভাশালী কবি পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে আর কেহ জন্মেন নাই। বাংলা কাব্যসাহিত্যে তাঁহার দান বিবিধ ও অবিনশ্বর।

ভারতচন্দ্রের ভাষা আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যেরও অনুকরণীয়; ভারতচন্দ্রের শব্দসম্পদ বিপুল। ফার্শী ও উর্দ্দ শব্দাবলী দ্বারা সুপাঠ্য বাংলা কবিতারচনা, ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে, বোধ করি, আর কেহ করিয়া এমন সফল হন নাই।

ভারতচন্দ্রের রচনা অলঙ্কারসমৃদ্ধ কিন্তু কোথাও অশোভন বা ভারাক্রান্ত নয়। সংস্কৃত অলঙ্কারসম্মত উপমা যমক ব্যাজস্তুতি স্বভাববর্ণনা প্রভৃতি তাঁহার রচনায় প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বোধ হয় ভারতচন্দ্রই বাংলা-ভাষাকে প্রথম এই সব অলঙ্কারে এমন নিপুণ ভাবে সজ্জিত করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের বাংলা ছন্দ বাংলাভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। ভারতচন্দ্রে আমরা ৪৫ রকমের বাংলা ছন্দ পাই। এ সবই কবির অনন্ত সৃজনী শক্তির ও অপূর্ব্ব প্রতিভার অপরূপ সৃষ্টি। আজও ভারতচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত

ছন্দসম্ভারেই বাংলার কাব্যসাহিত্য সমৃদ্ধ। ভারতচন্দ্রের মিলও সর্ব্বত্র প্রথম শ্রেণীর। বারে-শিরে, আজি-খুঁজি, মহা-তপা প্রভৃতি ধরণের মিল ভারতচন্দ্রে কোথাও নাই।

সংস্কৃত ছন্দের স্বর ও যতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ রচনা ভারতচন্দ্রই প্রথম করেন। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে বিদ্যাপতি ও বৈষ্ণবপদ-কর্ত্তাদের অনেকেই হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণভেদে বাংলা কবিতা রচনা অবশ্য করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু স্বরসন্নিবেশে যে সেগুলি নিভুর্ল হয় নাই, একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ভারতচন্দ্র খাঁটি বাংলায় যে-সব সংস্কৃত ছন্দ রচনা করিয়াছেন, তাহার কুত্রাপি এতটুকু স্বরদোষ ঘটে নাই।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন তাঁহার অপূর্ব্ব শ্যামাসঙ্গীতে ও সেই সঙ্গীতের জন্য একটি বিশিষ্ট সুরসৃষ্টির জন্য সুবিদিত। রামপ্রসাদের এই সুর "প্রসাদী" সুর নামে বিখ্যাত।

রামপ্রসাদের অনুসরণে বহু কবি শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে দুইজন মুসলমান কবির রচিত শ্যামাসঙ্গীতও পাওয়া যায়। ইহাদের নাম—মির্জ্জা হোসেন ও সৈয়দ জাফর খাঁ।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অনুসরণে ১৬শ শতাব্দীতে বৈষ্ণবপদাবলী রচনার যেমন এক প্রবল বন্যা আসিয়াছিল, ১৮শ শতাব্দীর শেষ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ অবধি রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত প্রমুখ জনপ্রিয় শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রথমটা শ্যামা সঙ্গীত, পরে নানাবিষয়ক সঙ্গীত রচনার এক যুগ আসিয়াছিল। ইহার ফলে রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) গোপাল উড়ে প্রভৃতি কয়েকজন কবি হিন্দুস্থানী টপ্পার অনুকরণে বাংলা টপ্পা রচনা করিয়া, বাংলার সঙ্গীত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

বাংলাসঙ্গীতের এই জনপ্রিয়তায় আকৃষ্ট হইয়া কবির গান নামে এক গানের দলের সৃষ্টি হয়।

১৯শ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই "কবির গান" এ দেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ১৯শ শতাব্দীর প্রথমে তাৎকালীন শ্রেষ্ঠ কবি ও সাংবাদিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ও প্রথম জীবনে কবির গান রচনা করিতেন। ক্রমশঃ কবির গানও বিলুপ্ত হইল, তাহার স্থানে জন্মিল কালিয়দমন বা কৃষ্ণযাত্রা।

১৯শ শতাব্দী

১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ছিল কবি দাশরথি রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যুগ। শেষার্দ্ধের মধ্যে আমরা পাইয়াছি—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রজনীকান্ত সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, মোজাম্মেল হক, কায়কোবাদ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কবিগণকে।

এখানে বলা আবশ্যক, উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়া বহু জনপ্রিয় কবি, তাঁহাদের অপরূপ কাব্যনৈবেদ্যে অদ্যাপি বঙ্গবাণীর অর্চ্চনা করিতেছেন, তাঁহাদের কাহারও নাম এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত না হইয়া, কেন যে কেবল স্বর্গতদেরই নামোল্লেখ হইল, তাহা বোধ করি স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও চলে। পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, ইঁহারা সকলেই দীর্ঘায়ু হউন, শতায়ু হউন।

১৯শ শতাব্দীর কাব্যের কথায় সর্ব্বপ্রথমেই মধুসূদনের নাম মনে আসে। মধুসূদনের কাব্যেই আমরা প্রথম জানিতে পারি—বাংলাভাষার অন্তর্নিহিত তেজ, বেগ ও শক্তি। মঙ্গলকাব্যগুলিই বাংলাভাষার শেষ কথা নহে, বাংলাভাষার সম্ভাবনা দিগন্তবিসর্পী। বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও চতুর্দ্দশপদী কবিতা মধুসূদনের অপূর্ব্ব প্রতিভার দান।

হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র রঙ্গলাল এবং কিছুদিন পরে দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গ-সাহিত্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তার উদ্বোধক কবিরূপে চিরদিন শ্রদ্ধার্ঘ্য

পাইবেন। দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্ট দান বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের অবতারণা ও সুমার্জ্জিত নাট্যসাহিত্য।

১৯শ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের হাতে বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য অভিনব শ্রীতে রূপায়িত হইয়া কিরূপে যে জগদ্বরেণ্য হইয়াছে, সে কথা বোধ হয় আজ আর কাহাকেও নূতন করিয়া শুনাইতে হইবে না। অগাধ অতলস্পর্শ রবীন্দ্রসাহিত্যের যৎসামান্য পরিচয়ও এ ক্ষুদ্র পরিধিতে সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভার সূর্য্যালোকে বঙ্গসাহিত্যের হিমাদ্রিশৃঙ্গ হইতে ক্ষুদ্র গৃহকোণ পর্য্যন্তও আজ সমালোকিত। আমাদের দুর্ভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথ আজ সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়ান করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্য আজ অনাথ, বঙ্গসাহিত্যের তরী আজ কাণ্ডারীবিহীন।

অত্যন্ত দুঃখের সহিতই স্বীকার করিতে হইতেছে যে আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যে সচরাচর আমরা যাহা পড়িতেছি, তাহা কাব্য ত নয়ই, সাহিত্যও নয়। কাব্যের নামে দেখি স্বেচ্ছাচার কসরৎ এবং বিকৃত মনোবৃত্তির উৎকটতর অভিব্যঞ্জনা। সকলেই নূতন-একটা-কিছু করার মোহেই দিক্‌ভ্রান্ত, অথচ সেই নূতনত্বের প্রয়াসটা যদি রসপ্রধান কাব্যসৃষ্টির দিকে ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে কত শোভনই না হইত!

বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা কয়েক জন শক্তিমানকে পাইয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের সে শক্তি যদি অযথা ব্যয় ও অপথে ধাবিত হয়, তাহা হইলে, বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি সুনিশ্চিত। নানাবিধ পশ্চিমা বুলির প্রচ্ছদপটে ঢাকিয়া ও পশ্চিমের আবহাওয়ায় বাংলাসাহিত্য অনুরঞ্জিত করিয়া, নূতন করিয়া যাঁহারা বাংলা সাহিত্যকে গড়িতে উদ্যোগী, তাঁহারা এখন না বুঝিলেও, বিলম্বে আক্ষেপ করিবেনই—"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়।"

যে-সাহিত্যের সঙ্গে দেশের মাটির ও দেশের লোকের, দেশের সংস্কৃতি সভ্যতা সুখদুঃখ অভাবঅভিযোগ ও চিন্তার সঙ্গে নিবিড় সংযোগ

নাই; সে-সাহিত্য জাতীয় সাহিত্য হয় না; আর জাতীয় সাহিত্য না হইলে, জাতির অন্তরে বা বাহিরে কোথাও তাহার স্থান নাই। এ সব অপসাহিত্য না হইলেও, উপবৃক্ষের মত উপসাহিত্য হইয়াই থাকিবে, তার পর একদিন সকলেরই অলক্ষে শুকাইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। বাংলার কাব্যসাহিত্য বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস-জ্ঞানদাস, ভারতচন্দ্র-মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রলাল-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিভাধরদের সাধনায় যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, সেইটিই বঙ্গবাণীর আসল রূপ। আমরা এই রূপের সেবা করিবারই অধিকারলাভ করিয়াছি, বিরূপ করিবার জন্য নয়।

বঙ্গসাহিত্যে রচনার বাহন এতদিন পদ্যই ছিল, এখন পদ্য ও গদ্য দুইটি। গদ্যসাহিত্য আমাদের আলোচ্য নয়। পদ্যসাহিত্য যে দিন দিন দরিদ্রতর হইতেছে, একথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। তবে আজকার দিনে কাব্যসাহিত্যে যে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী, বলিষ্ঠ অভিব্যঞ্জনা ও অভিনব সৌবার্দ্য রচনার প্রয়োজন আছে, একথা আমি অস্বীকার করি না। তবে কাব্যসাহিত্য নামে যাহা রচিত হইবে, তাহা যেন কাব্য ও সাহিত্য দুইই হয়, ইহাই আমার আবেদন।

বাংলা কাব্যসাহিত্য জন্মাবধি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মসাহিত্যরূপে বাড়িয়াছে বলিয়া, সর্ব্বত্র সাহিত্যধর্ম্ম হয়ত রক্ষিত হয় নাই, কিন্তু বর্ত্তমানে ধর্ম্মীয় সাহিত্য যখন আর রচিত হয় না, তখন রচনা যেন সাহিত্যধর্ম্মীয় হয়, ইহাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি। *

কলিকাতা

২৪শে মার্চ্চ, ১৯৪৫

* ১লা ও ২রা এপ্রিল ১৯৪৫, দৌলতপুরে (খুলনা) বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সংম্মেলনের ৩য় অধিবেশনে কাব্যশাখার সভাপতির অভিভাষণ।

কি বাণান হওয়া উচিত

'কি বাণান হওয়া উচিত' এ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ কিছু বলিবার সুযোগ দিয়া আমায় যথেষ্ট আপ্যায়িত করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই স্বল্প কালের মধ্যে এমন একটী বিতর্কবহুল ব্যাপারের বিশদ আলোচনাও সম্ভব নয়। কাজেই আজিকার বক্তব্যে আমি বাণানের মূলতত্ত্ব লইয়াই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। পুনরায় যদি এরূপ সুযোগ মিলে, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে আরও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য নিবেদন করিতে পারিব বলিয়া আশা করি।

আধুনিক বাংলায় যে বাণানবিভ্রাট ঘটিতেছে তাহা যে-কোনও বাংলা বই বা পত্র-পত্রিকা খুলিলেই চোখে পড়ে। বাণানবিভ্রাটের শুরু হয় ক্রিয়াপদগুলিকে লইয়া: যেমন সাধু অর্থাৎ ব্যাকরণসম্মত নিয়মে, লিখিত হয়—করিতেছি। সাধু ভাষায় 'করিতেছি'-র বাণান, এই একটিই, আর নাই, কিন্তু আধুনিক প্রগতিবাদীদিগের হাতে করিতেছি-র কথ্য বা চলিতরূপ, লেখ্যরূপে প্রচলিত হইয়াছে—করছি, কোরচি, কোরছি, কর্চি, কর্ছি, কোর্চি, কোর্ছি, কচ্চি, কচ্ছি, কোচ্চি, কোচ্ছি ইত্যাদি বহু বিচিত্র রূপে।

ক্রিয়া পদ হইতে ক্রমশঃ অন্যান্য দুই চারিটি শব্দেও বাণানসংস্কারের ঢেউ লাগিল, যাহার ফলে তাঁহারা লিখিতে লাগিলেন—ভালো, বড়ো, ছোটো, মতো, যতো, ততো, ইত্যাদি। অথচ ইহারা দেখিলেন না যে, দুই অক্ষরের অকারান্ত বিশেষণ পদগুলির বৈশিষ্ট্যই এই অন্ত্য অকারের ও-রূপে উচ্চারণ। লেখ্য ভাষাকে কথ্য ভাষার অনুরূপ করিতে এই ও-দিয়া বাণান আরম্ভ হইল, কিন্তু আরও যেখানে অকারের ও-উচ্চারণ হয়, সেখানে ত ও-যোগ হইল না? যেমন বন, মন, ধন, অমর, আনন্দ, নলিনী বনিক ইত্যাদি। আমার বক্তব্য এই যে, যতো বড়ো

প্রভৃতিতে যদি ও দিয়া বাণান লেখা যায়, তাহা হইলে বন, মন, নলিনী প্রভৃতিতে ও-যোগ হইবে না কেন?

বাণানের এই বৈষম্য ও বিশৃঙ্খলায় এবং তথাকথিত কথ্য ভাষার লেখকদিগের বাংলা বাণানের সংস্কার প্রার্থনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও বিচলিত হইলেন। তাঁহারা বাংলা বাণানের সংস্কারের জন্য এক সমিতি গঠন করিলেন। সমিতি মত দিলেন—রেফের পর বর্ণের দ্বিত্ব হইবে না, যেমন দুর্ব্বল, দুর্বল লিখিলেই চলিবে। এ নিয়ম পুরাকাল হইতেই প্রচলিত অর্থাৎ রেফের পর বিকল্পে দ্বিত্ব হয়—সুতরাং এ আদেশ বিশ্ববিদ্যালয় নূতন দিলেন না।

বাংলা বাণানসংস্কার সমিতির দ্বিতীয় নির্দেশ ঙ-য়-গ-য়ের যে বিচিত্ররূপ হয়, সেটি ভাঙিয়া ং এবং গ-কে স্বতন্ত্র ভাবে লেখা চলিবে। এ রীতিও সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুযায়ী, সুতরাং এটিতেও সমিতি নূতন কিছুই করিলেন না।

সমিতির তৃতীয় সিদ্ধান্ত ছিল ঊর্দ্ধ প্রভৃতি শব্দের বাণানে দ-ধ ও ব-য়ে রেফ-এর স্থানে কেবল ধ-য়ে রেফ দিলেই চলিবে। এই আদেশে ঊর্দ্ধ কথ্য রূপ পাইল বটে, কিন্তু তাহার ঐতিহ্য হারাইয়া ফেলিল।

এই তিনটী ছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণানসংস্কার সমিতি বাংলার প্রচলিত বাণানে আর কোথাও হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই।

এখন আর একদল আবার আসিয়াছেন, যাঁহারা বাংলা বাণানের আমূল সংস্কার প্রয়াসী। ইহারা বলেন, ই-ঈ, উ-ঊ, জ-য, ন-ণ, ঙ-ং, ত-ৎ বর্গীয়-ব অন্ত্য-ব এবং শ-ষ-স প্রভৃতি বর্ণগুলির মধ্যে একটিকে রাখিয়া অন্যটিকে ফাঁসি দেওয়া হউক। ঞ-কেও দ্বীপান্তরের আসামী করিতে ইহারা ছাড়েন নাই। আমি বলি, এগুলি বর্জ্জন করিলে বাংলা ভাষার যদি কোনও ক্ষতি বা অঙ্গহানি না হইয়া, বাংলা ভাষা অধিকতর

সহজ ও সরল হয় তাহা হইলে আমাদের দেহ হইতে ২০টি আঙ্গুলের কয়েকটি আঙ্গুল ও দুইটি কাণের মধ্যে একটি কাটিয়া বাদ দিলেও ত দেহের কোনও ক্ষতি হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বরং দেহটি অনেকটা নির্ভার ও সরল হইয়া যাইতে পারে।

প্রগতিশীল বাণানসংস্কারপন্থীদের উক্ত প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে প্রতিগতিশীল অর্থাৎ বাণানসংস্কারের বিপক্ষ দল বলেন—যাহা আছে তাহাই থাকিবে আর থাকা উচিত-ও।

বাণানসংস্কারের বিপক্ষ দল প্রশ্ন করেন ঃ—বাণানসংস্কারের কি প্রয়োজন? প্রচলিত বাণানে অসুবিধা কি এবং কোথায়?

ইহার উত্তরে সংস্কারপন্থীরা বলেন—

(১) বাণান কথ্য ভাষার অনুরূপ হইলে ভাষা সুপাঠ্য ও সর্ব্বজন বোধগম্য হয়।

(২) যে বর্ণ উচ্চারিত হয় না, অকারণ কেন তাহা লিখিয়া সময় ও শ্রমের অপব্যবহার করা?

(৩) বাণান অনুযায়ী যদি উচ্চারণই না হয়, তাহা হইলে সে বাণানের সার্থকতা কি?

(৪) বাণান সরল হইলে উচ্চারণও সহজ হইবে, তদ্বারা বিদেশীর পক্ষে বাংলা শেখা অনেকটা সুকর হইবে।

(৫) বাণান সরল হইলে বাংলা ছাপার কাজ যেমন দ্রুততর হইবে তেমনি বাংলা টাইপরাইটারের ব্যবহারেও বহু সুবিধা হইতে পারে।

সংস্কারপন্থীদের প্রধানতঃ এই ৫টী যুক্তি। সংস্কারের বিপক্ষ দল বলেন :—

(১) বাণান যদি কথ্য ভাষারই অনুগামী করিতে হয়, তাহা হইলে শুধু ক্রিয়াপদ এবং অন্যান্য দুই দশটী শব্দের বাণানেই কেন সে নিয়ম সীমাবদ্ধ থাকিবে? ঠিক আমরা যেমন উচ্চারণ করি, লেখ্য ভাষাতে

সেই মত বাণানই প্রবর্ত্তন করা উচিত। যেমন, কথা - আমরা বলি কতা, কোথা—আমরা বলি কোতা, মেঘকে বলি মেগ, বাঘকে বলি বাগ, আবার শাককে বলি শাগ, বককে বলি বগ, কাককে বলে কাগ— "কাগাবগা আয় আয়" বলিয়া ছেলেও ভুলাই, সিংহকে বলি শিঙভি ইত্যাদি। অতএব কথ্য ভাষায় লিখিবার নিয়মে এইরূপেই লেখা কর্ত্তব্য। কই, এরূপ ত কেহ লিখে না?

দ্বিতীয়তঃ, কথ্য ভাষাই যদি একমাত্র লেখ্য হয়, তাহা হইলে কোনও বিশেষ স্থান বা প্রদেশের কথ্য ভাষাই যে লেখ্য হইবে এবং অন্যান্য সব কথ্য ভাষা লেখায় অপাংক্তেয় থাকিয়া যাইবে, এ কিরূপ বিধান? অতএব, লেখ্যভাষায় বাংলার বিভিন্ন জেলার বিচিত্র ক ্য ভাষাও ব্যবহৃত হইতে পারিবে। এ দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে কীদৃশ বিচিত্র রূপ হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

আর যদি সংস্কারপন্থীগণ বলেন যে, একমাত্র কলিকাতার কথ্য ভাষাই লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হইবে, অন্য কোনও স্থানের কথ্য ভাষা এ সম্মান পাইবে না, তাহা হইলে প্রথমেই আপত্তি হইবে, কলিকাতার কথ্য ভাষাই শুধু এ মর্য্যাদা পাইবে কেন? বাংলা দেশ বলিতে কি শুধু কলিকাতাই বুঝায়? বাংলা দেশে কথ্যভাষা কি সর্ব্বত্রই এক? এতদ্বারা কি অন্যান্য জেলার কথ্য ভাষাকে অসম্মান করা হয় না?

অপর পক্ষে, যাঁহারা সাধারণতঃ মফঃস্বলে বাস করেন, বিশেষ কাজে কালে-ভদ্রে কলিকাতায় আসেন এবং কার্য্য শেষ করিয়াই চলিয়া যান, তাঁহারা কলিকাতার ভাষা কি করিয়া আয়ত্ত করিবেন?

তৃতীয়তঃ, যদি কলিকাতার কথ্য ভাষা শিক্ষা করিয়াই লিখিতে হয়, তাহা হইলে যে-বাংলা ভাষা আজ শতাধিক বৎসরে পুষ্ট হইয়া বৈয়াকরণিক ও অন্যান্য নিয়মে এবং রীতিতে সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া গিয়াছে, সেই ভাষাতে লিখিতেই বা ক্ষতি কি?

ইহাদের এটা জানা উচিত যে, কোন স্থানের কথ্য ভাষা শিক্ষা, সেখানকার লেখ্য ভাষা শিক্ষা অপেক্ষা বহুগুণ কষ্টসাধ্য। অতএব ব্যাপার এই দাঁড়াইতেছে যে, প্রস্তাবিত বাণানসংস্কারের নিয়মে বাংলায় লিখিতে হইলে কলিকাতার বাসিন্দা হইতে হইবে। নূতন বাসিন্দার স্থানীয় কথ্য ভাষাটি সঠিকভাবে আয়ত্বে আনিতে কিছু বিলম্ব ঘটা স্বাভাবিক। কাজেই, প্রথম পুরুষ অপেক্ষা দ্বিতীয় পুরুষ হইতে নব্য বাংলার লেখক হওয়া কিঞ্চিৎ সহজ হইতে পারে। এই সব আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, কথ্য ভাষা প্রচলনে যখন এত অসুবিধা, তখন প্রচলিত বাণানরক্ষাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন যে যে-ইংরাজী ভাষা আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত, তাহারও একাধিক কথ্য রূপ আছে। ইংলণ্ডের বিভিন্ন প্রদেশেই বিভিন্ন ভাবে ইংরাজী কথিত হয় অর্থাৎ যে-ভাষা লিখিত হয়, ঠিক সেই ভাষাটী কথিত হয় না। অথচ এই সব ইংরাজ উচ্চারণ-অনুযায়ী কথ্য ভাষায় ইংরাজী লেখেন না। ভারতবর্ষেও ইংরাজদের কথ্য ভাষা যে লেখ্য হইতে অনেক বিষয়ে বিভিন্ন, তাহা ইংরাজের সঙ্গে যাঁহারা বিশেষ ভাবে মেলামেশা করেন, তাঁহারা ভালই জানেন। ইংরাজী ভাষা যে আজ পৃথিবীব্যাপী, তাহার কারণ, ভাষার এই সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলা— ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাংলার আধুনিক লেখকগণের মত, ইংরাজ লেখকগণ যদি ভাষার বাণানে ব্যবহারে ও রীতিতে যথেচ্ছাচার করিতেন, তাহা হইলে ইংরাজী ভাষার ভাগ্যে এই সার্ব্বজনীন মর্য্যাদা লাভ কখনও ঘটিত কি না, তাহা ভাগ্যদেবতাই বলিতে পারেন।

(২) সংস্কারপন্থীদের দ্বিতীয় যুক্তি: যে-বর্ণ উচ্চারিত হয় না, অকারণে তাহা লিখিয়া কেন সময় ও শ্রমের অপব্যবহার করা। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য বাংলা বাণানে অনুচ্চারিত বর্ণের স্থান নাই। যে বর্ণ অনুচ্চারিত মনে হইতেছে, সেগুলি অশুদ্ধ উচ্চারণের জন্যই ওরূপ

মনে হয়। আদিতে সেগুলি যথাযথ উচ্চারিত হইত বলিয়াই, শব্দের বাণানে সেগুলি চলিয়া আসিতেছে। বহুকাল যাবৎ অশুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া, আমরা শুদ্ধ উচ্চারণ ভুলিয়া, অশুদ্ধকেই শুদ্ধ মনে করিতেছি বলিয়া, এই সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। বাংলা বাণানে যে প্রয়োজনাতিরিক্ত বর্ণ থাকিতে পারে না, তাহার কারণ প্রত্যেক শব্দেরই বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি-প্রকরণ আছে: যেমন ধাতু, কৃৎ, তদ্ধিত, বা অন্য কোনও প্রত্যয়ের দ্বারা তাহারা সিদ্ধ অর্থাৎ সৃষ্ট। এ জন্য প্রত্যেক তৎসম ও তদ্ভব শব্দের গঠন হইয়াছে প্রয়োজনমত বর্ণসংযোগে ; অনুচ্চারিত বর্ণের স্থান ইহাদের মধ্যে নাই।

তৎসম, তদ্ভব ও প্রাকৃতজাত বাংলা শব্দই বাংলা শব্দকোষে বেশী, সুতরাং ইহাদের বাণান অপরিবর্ত্তনীয়। বাংলা শব্দভাণ্ডারে ঢেঁকি, টোকা, ধামা, ধুচুনী, নোড়া প্রভৃতি বহু দেশী শব্দ আছে ; রেল, ষ্টীমার, জমা, খরচ, লিচু, চা, রিক্স, আয়া, চাবি, সাবান, হরতন রুইতন প্রভৃতি বহু বিদেশী শব্দও আছে। এই সব শব্দের বাণানে তেমন কোনও বাঁধাধরা নিয়ম না থাকিলেও, ইহাদের বাণানেরও একটা ব্যবহারিক রীতি ঠিক হইয়া গিয়াছে।

বাণানে অপ্রয়োজনীয় বা অনুচ্চারিত বর্ণসংযোগ ভারতীয় কোন ভাষাতেই হয় না। হয় বিদেশীয় বহু ভাষাতে। উদাহরণ স্বরূপ ইংরাজী ভাষাই ধরা যাইতে পারে। ইংরাজী Psalm (সাম) Quay (কী), Key (কী), Through (থ্রু), Though (দো), Match (ম্যাচ) ইত্যাদি।

ইংরাজীতে স্বরবর্ণগুলিও বহুরূপী। যেমন Ball, Bale, Bail, Ban, Balm ; Be (ঈ), Bee (ঈ) Met, Fate (ই লুপ্ত) ; Good (উ) Goose (উ), Blood ; Cut, Put, Cure (ইউ), Use ; Thought (থট) ইত্যাদি। এরূপ কোন সম্ভাবনা বাংলায় নাই। সুতরাং যেখানে স্বরাতীত বা বিকৃত উচ্চারণ শুনি, সেখানে অশুদ্ধ উচ্চারণের জন্যই ওরূপ হয়। কাজেই, বাণান পরিবর্ত্তনের জন্য এ যুক্তিটিও ভিত্তিহীন।

(৩) সংস্কারপন্থীদের তৃতীয় যুক্তি বাণান অনুযায়ী যদি উচ্চারণই না হয়, তাহা হইলে সেরূপ বাণানের সার্থকতা কি? ইহার উত্তর, পূর্ব্ব-বক্তব্যেই প্রদত্ত হইয়াছে যে বাণান অনুযায়ী উচ্চারণ যে হয় না, তাহার কারণ আমাদেরই অশুদ্ধ উচ্চারণ। অশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য মূল শুদ্ধ বাণানকে পরিবর্ত্তিত করিয়া অশুদ্ধ বাণান লিখিবার কোনও হেতু বা যুক্তি নাই।

অশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য যদি শুদ্ধ বাণানকে অশুদ্ধভাবে লিখিতে হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তীকালে আবার লোকে যখন অশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিবে, তখন আবার এই বাণানকেও তদনুরূপ করিয়া লিখিবার নির্দ্দেশ দিতে হইবে। তাহা হইলে বাণানসংস্কার যুগে যুগে চলিতেই থাকিবে, কোনও দিনই ইহার শেষ হইবে না।

এজন্য অশুদ্ধ উচ্চারণের সম্ভাবনা যাহাতে আর না বাড়িতে পারে, তজ্জন্য মূল বাণানই অক্ষুণ্ণ রাখা উচিত। বাণান বদলাইলে উচ্চারণ বিকৃতি দিন দিন আরও বাড়িতে থাকিবে।

শব্দগুলি একবার মূলচ্যুত হইয়া পড়িলে ক্রমশঃ তাহারা এমন দুর্ব্বোধ্য ও বিকৃত হইয়া পড়িবে যে তখন আর তাহাদের জন্মের ইতিহাসটি পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

(৪) বাণানসংস্কারকামীদিগের চতুর্থ যুক্তি এই যে, বাণান সরল হইলে বিদেশীদিগের বাংলা ভাষাশিক্ষা অনেকটা সহজ হইবে। ইহার অর্থ, অন্যের শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য বাংলা ভাষাকে অনৈতিহাসিক ও অবৈজ্ঞানিক করিয়া তাহাকে বিকৃত করিতে হইবে। এটি যে কি অদ্ভুত ও হাস্যকর যুক্তি, তাহা ইঁহারা গভীর ভাবে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন না।

কোন ভাষাই কোন বিদেশী সহজে আয়ত্ত করিতে পারে না। ইহা করিতে হইলে চাই অধ্যয়ন অভ্যাস ও অনুশীলন। এ যাঁহারা করেন, তাঁহারা যে কোনও বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিতে পারেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই বহু বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা কি সেগুলি

অত সহজেই আয়ত্তে আনিয়াছেন ? বাংলা ভাষা শিক্ষাই বা অত সহজে কি করিয়া হয় ? বাংলা ভাষা শিখাইবার জন্য আমাদের এই অযাচিত ও অসম্ভব সৌকর্য্য ও সুবিধাদানের আগ্রহাতিশয্যে কি আমাদের অন্তরের দৈন্যই প্রকাশ পাইতেছে না ? বাংলা ভাষায় যদি সাহিত্যবস্তু থাকে, বাংলা ভাষা যে-কোনও জ্ঞান-লিপ্সু বিদেশী শিখিবেনই; আর যদি এ ভাষার সাহিত্য অন্তঃসারশূন্য হইতে থাকে, তাহা হইলে ভাষা ও বাণান যত সহজ ও সরলই করা হউক না কেন, কেহই এ ভাষার ত্রিসীমানাতেও পদার্পণ করিবে না।

বহু জার্ম্মান, ফরাসী ও ইংরাজ পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া বেদ পুরাণ উপনিষদাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাহাদের ভাষ্য পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছেন; উক্ত সব গ্রন্থের বিষয়বস্তু লইয়া কত গবেষণাও করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। বাংলা ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃত বিশেষতঃ বৈদিক সংস্কৃত নিশ্চয়ই সহজ বা সরল নয়, তবু যাঁহারা বিদ্যাব্রতী তাঁহারা এই দুস্তর সাগরেরও পারগামী হইয়াছেন। কেহ কেহ এই সংস্কৃত ভাষায় এমন সুপণ্ডিত যে আমাদের দেশের অনেক পণ্ডিত আজীবন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা করিয়াও এই সব বিদেশী পণ্ডিতদিগের নিকটে পর্য্যন্ত ঘেঁষিতে পারেন না। কাজেই, বাণান সংস্কার করিলেই যে বাংলা ভাষা বিদেশীর নিকট খুব সহজ ও সুবোধ্য হইবে, এ অতীব হাস্যকর যুক্তি।

(৫) সংস্কারকামীদিগের শেষ যুক্তি বাণানসংস্কার করিলে বাংলা ভাষায় মুদ্রণ ও টাইপের কাজ কিছু দ্রুততর হইতে পারিবে। হয়ত পারিবে, কিন্তু দ্রুত মুদ্রণ ও টাইপ করাই একটা ভাষার যোগ্যতার একমাত্র পরিচায়ক নহে। আর এই যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য যদি ভাষার ঐতিহ্য অবলুপ্ত করিয়া দিয়া, শব্দগঠনবিজ্ঞানকে বিসর্জ্জন দিয়া, ভাষার সমগ্র শব্দকোষকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে ভাঙা

বাড়ী মেরামৎ না করিয়া, একটা নূতন ইমারৎ তৈরি করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কথ্য ভাষানুযায়ী বাণান প্রবর্ত্তনের জন্য যদি বর্ণমালার পর্য্যন্ত আমূল সংস্কার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বাংলা ভাষা ছাড়িয়া দিয়া, একটি নূতন ভাষা সৃষ্টি করিয়া লওয়াই কি সুবিধা নয় ?

উপসংহারে আমি শুধু এইটুকুই বলিতে চাই যে ব্যাকরণ বজায় রাখিয়া যতটা বাণান সংস্কার সম্ভব, তাহা করা যাইতে পারে, তাহার অধিক এতটুকু নয়। বাণানের এই বিশৃঙ্খলা নিবারণকল্পে, আমার মতে লেখায় কথ্য ভাষার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করা উচিত ! *

২০।৪।৪৪

---

* ৬ই মে ১৯৪৪ কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে পঠিত

ভাষণ

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্‌বিদ্যাভূষণ মহাশয়, পরমভাগবত বৈষ্ণববন্ধুগণ ও সমবেত সাহিত্যিক সতীর্থগণ—

সর্ব্বপ্রথমেই আপনাদিগকে আমি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম ও অভিবাদন নিবেদন করি। আপনাদের সুদুর্ল্লভ আশীর্ব্বাদ লাভ মাদৃশ অকৃতি জনের আশার অতীত। আপনারা জ্ঞানী ভক্ত ও সর্ব্ববিধ বিদ্যায় পারগামী, আপনাদের নিকট আমার নগণ্য সাহিত্য-সেবা আজ যে উৎসাহ লাভ করিল, আশীর্ব্বাদ করুন্, তাহা সূর্য্যালোকের মত যেন আমার পথপ্রদর্শকই হয়, তাহার ঔজ্জ্বল্যে ও তাপে আমার চক্ষু ধাঁধাইয়া দিয়া, কখনও যেন আমার দিকভ্রান্তি না ঘটায়। আমার রচনাবলী ভবাদৃশ মহাজনগণের কিঞ্চিৎ পরিমাণেও যে চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তজ্জন্য নিজেকে আমি পরম ভাগ্যবান্ মনে করিতেছি।

আমি সেবক, সেবাই আমার ধর্ম্ম। আমার সেবা যে আপনাদের গ্রহনীয় হইয়াছে এবং সমাদর লাভ করিয়াছে, ইহাতে আমার সেবা যেমন সার্থক হইয়াছে, আমিও তেমনি কৃতার্থ হইয়াছি। কাজেই, আমার কৃতজ্ঞতার হেতু, আচার্য্যদেব অনায়াসেই অনুধাবন করিতে পারিতেছেন :—

যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্য চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।

শ্রীমদ্ভাগবত, ১ স্কন্ধ, ২৯অ, ৬ শ্লোক।

ভবাদৃশ ভাগবতগণ তীর্থস্বরূপ। আপনাদের সামীপ্যলাভে আমি ধন্য হইলাম:

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥

—শ্রীমদ্ভা, ১ম স্ক। ১৩ অ। ৮ শ্লো।

আপনাদের সম্মুখে আমার মুখব্যাদান করা সাজে না:

"তোমার আগে ধাষ্ট্য এই মুখব্যাদান—"

চৈ, চ, অন্ত্য। ১ম। ১৭৪

কিন্তু অপার বাৎসল্যে ও স্নেহদৌর্ব্বল্যে আপনারা আমার প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন, জানি:

—"কাঁহা তুমি সূর্য্যোপম ভাস।
মুঞি কোন্ ক্ষুদ্র—যেন খদ্যোতপ্রকাশ।"

চৈ, চ অন্ত্য। ১ম। ১৭৩

আপনারা

"নিজাঙ্কুরে পুলকিত পুষ্পে হাস্য বিকশিত"

তাই আপনাদের

"মধুবিষে বহে অশ্রুধার।"

আর সেইজন্যই আমার মত নগণ্য বংশকেও বেণুর মর্য্যাদা দিতেও আপনারা কুণ্ঠিত নহেন:

বেণুরে মানি নিজ জাতি আর্য্যের যেন পুত্রনাতি
বৈষ্ণব হৈলে আনন্দবিকার।"

—চৈ, চ, অন্ত্য। ১৬শ পরি। ১৪৮

আচার্য্যদেব ও বন্ধুগণ, আপনাদের প্রীতিসাধন ও তজ্জনিত এই স্নেহাশীর্ব্বাদ লাভই আমার সাহিত্যসেবকের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। এ পুরস্কারের মূল্য হয় না, ইহা অমূল্য :

স্রজং ন কাচিদ্বিজহৌ জলাবিলাং
বসন্তি হি প্রেম্ণি গুণা ন বস্তুনি ॥

—কিরাতার্জ্জুনীয়, ৮ম সর্গ। ২০ শ্লোক

আপনাদিগকে পুনরায় প্রণাম ও অভিবাদন করি। ইতি সন ১৩৫০ সাল ৩রা পৌষ।*

* সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর আহূত জনসভায় শতংজীব আচার্য্য শ্রীযুক্ত রসিক-মোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক "কাব্যরত্নাকর" উপাধিপ্রদানের প্রত্যুত্তরে পঠিত। ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪২

সাহিত্যের উৎপত্তি

পদ্য গদ্য এবং পদ্য-গদ্য মিশ্রিত তাবৎ রচনাই অর্থাৎ সর্ব্ববিধ রচনার ব্যাপক সংজ্ঞারূপে এখন 'সাহিত্য' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। পদ্য গদ্য এবং পদ্যগদ্য মিশ্রিত রচনা আরম্ভ হইবার বহু পরে বিশ্বনাথ কবিরাজ মহাশয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থেই বোধ হয় এই ব্যাপক অর্থাত্মক 'সাহিত্য' সংজ্ঞাটি প্রথম ব্যবহার করেন। সাহিত্য-দর্পণের পূর্ব্বেকার যত গুলি অলঙ্কারগ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান, তাহাদের সবগুলিই কাব্য-সম্বন্ধীয়: যেমন কাব্যচন্দ্রিকা, কাব্যপ্রদীপ, কাব্যপ্রকাশ, কাব্যাদর্শ প্রভৃতি। প্রাচীন যুগে ছন্দোবদ্ধ রসাত্মক বাক্য অর্থাৎ কাব্যই ছিল রচনার একমাত্র বাহন, কাজেই কাব্যের বিষয় বর্ণনাতেই অলঙ্কারগ্রন্থ-গুলিও পরিপূর্ণ।

কাব্য সংজ্ঞাটি সেকালে অনেকটা একালের সাহিত্যশব্দের মতই ছিল; কেননা, 'গদ্য-পদ্য-প্রাকৃত-ভাষাময় গ্রন্থ' যে নাটক, তাহাকেও কাব্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়া দৃশ্যকাব্য বলা হইত। ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানে নাটকের সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে—গদ্যপদ্যপ্রাকৃতভাষাময়ো গ্রন্থঃ।

ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান জ্যোতিষ নক্ষত্রবিদ্যা অঙ্কশাস্ত্র চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থই পদ্যে রচিত হইত।

ভারতীয় সাহিত্যের শৈশব আমরা দেখি বৈদিক রচনায়, বেদে। বেদই আমাদের প্রথম গ্রন্থ এবং বেদের ঋক্‌রচয়িতা ঋষিদিগের মুখেই যে ভারতীয় ভাষাসমূহের আদি ভাষা ধ্বনিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে

বোধ হয় আজ আর কাহারও মতদ্বৈধ নাই। বেদের অপর নাম ছন্দস্। ছন্দস্ রচনায় যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল, সেই ভাষার নামও ক্রমশঃ ছন্দস্ নামে খ্যাত হইল। পালির জন্মকথাতেও এই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। প্রথমতঃ, বৌদ্ধশাস্ত্রকে অর্থাৎ ত্রিপিটককে পালি বলা হইত। পরে যে ভাষায় পালি অর্থাৎ বুদ্ধকথা লিখিত হইল, তাহার নামও পালি হইয়া যাওয়ায়, আমরা পাইলাম—পালি ভাষা।

ছন্দস্ অর্থে সমগ্র বেদ। বেদের বিভিন্ন সূক্তের বিবিধ ঋক নানা রীতিতে রচিত। ক্রমশঃ এই বিভিন্ন রচনারীতির নামও হইয়া পড়িল ছন্দস্।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, রচনারীতির অর্থাৎ ছন্দের এত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের কি প্রয়োজন হইয়াছিল? এক রকম ছন্দই আগাগোড়া অনুসৃত হয় নাই কেন? ইহার উত্তর, আমার মনে হয়, বেদের ঋকগুলি গীত হইত বলিয়া বিভিন্ন স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত উচ্চারণের অনুযায়ী বর্ণবিন্যাসের প্রয়োজন হওয়ায়, আপনাআপনি বিভিন্ন ছন্দেরও উৎপত্তি হইয়া পড়িয়াছিল।

বৈদিক ঋকগুলি বিভিন্ন সুর ও লয়ে গেয়, কাজেই বিভিন্ন সুর ও লয়ের বন্ধনে কথাগুলিকে বন্দী করিবার জন্য ছন্দোবৈচিত্র্যেরও প্রয়োজন স্বাভাবিক।

ঋক্‌গুলির উচ্চারণেরও নির্দেশ আছে। কোন সূক্তই এক সুরে পাঠ্য নয়। যেটি যে সুরে পাঠ্য বা গেয়, তাহার নির্দেশ প্রত্যেক সূক্তেই প্রদত্ত হইয়াছে। অধিকাংশ ঋক্ ষড়জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম ধৈবত ও নিষাদ এই ছয়টি সুরের কোনটিতে না কোনটিতে গেয়। পঞ্চমের নির্দেশ অপেক্ষাকৃত কম ঋকেই দেখা যায়। বৈদিক ঋক্‌গুলি গেয় ছিল বলিয়াই, সেগুলিতে ছন্দের ও সুরের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

বেদে ছন্দেরও বহু বিভিন্ন রূপের সাক্ষাৎ মিলে : গায়ত্রী, অনুষ্টুপ বৃহতী, ত্রিষ্টুপ, জগতী, ত্রিপাদবিরাড়্‌গায়ত্রী, উষ্ণিক, ককুপ ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে গায়ত্রীই আদি : গায়ত্রীচ্ছন্দসাং মাতঃ।

এই গুলিই যাবতীয় ছন্দের পিতামহ। ক্রমশঃ আদি অর্থের সঙ্কোচ ঘটিয়া কাব্যরচনার বিভিন্ন রীতির সাধারণ সংজ্ঞারূপে, ছন্দ শব্দ বর্ত্তমানে প্রচলিত।

অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে চন্দোবদ্ধ বাক্যই কাব্য। রামায়ণই 'আদিকাব্য বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ব্যাধ কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চমিথুনের একটি নিহত হইলে, শোকার্ত্ত বাল্মীকি মুনির মুখে স্বতঃ যে শোকবাণী উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহাই শ্লোক নামে পরিচিত হইয়াছে। মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহার রামায়ণের বালকাণ্ডে ২য় সর্গে বলিয়াছেন—

পাদবদ্ধোঽক্ষরঃ সমতন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ।
শোকার্ত্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা॥

বোপদেবের কবিকল্পদ্রুমে শ্লো'ক ধাতু সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—শ্লোক শ্ল ঙ সংঘাতে। শোকে সঞ্জাত বাণীই শ্লোক নামে খ্যাত। ক্রমশঃ অর্থবিস্তারে, শ্লোক এখন আর শোকপ্রকাশেই সীমাবদ্ধ নয়, সুখ-প্রকাশেরও বাহন হইয়াছে। বাংলায় শ্লোকের প্রাকৃতরূপ শোলোক এখন রূপকথার ইন্দ্রজাল রচনাতেই সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

অমরকোষকার শ্লোক অর্থে বলেন পদ্যম্। অতএব শ্লোক-রচয়িতা কবি। বাল্মীকিকে আদিকবি বা কবিগুরুও বলা হয়। ক্রৌঞ্চবধূর ব্যথায় বিগলিত হইয়া তিনি প্রথম শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে কবি কহা হয়। কবি কু ধাতু হইতে উৎপন্ন। কু ধাতুর অর্থ—শব্দ করা, বিশেষতঃ আর্ত্তস্বর উচ্চারণ করা। অতএব কবি

শব্দের অর্থ শব্দকারী, অর্থাৎ যিনি আর্ত্তস্বরে শব্দ করেন। ক্রমশঃ অর্থবিস্তারে, যিনি শোকার্ত্ত হইয়া শ্লোক রচনা করেন।

এইরূপে, কাব্য বা কবিতা আর্ত্তিরই অভিব্যক্তি। The Sweetest songs are those that tell of saddest thoughts। Saddest thoughtsই sweetest songs. আদি কাল হইতেই আর্ত্তি গীতরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

বৈদিক ঋক যখন গীত হইত, তখন ঋকরচয়িতা ঋষিরা নিশ্চয়ই গায়ক ছিলেন। রামায়ণও গীত হইত! বাল্মীকি একাধারে কবি এবং গায়ক ছিলেন। তিনি লবকুশকে রামায়ণ গান শিখাইয়া অযোধ্যায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। লবকুশ শ্রীরামচন্দ্রকে রামায়ণ গান করিয়া শুনাইয়াছিলেন।

গ্রীক আদিকবি হোমারও একাধারে কবি ও গায়ক ছিলেন। স্যাক্‌শন্ (Saxon) আদিকবি Caedmon স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পাইয়াছিলেন—Caedmon sing me something. পরবর্ত্তী যুগে ইয়ুরোপে Bard ও Ministrelগণও একাধারে কবি ও গায়ক ছিলেন।

ভারতে চারণ ও ভাটগণ একাধারে কবি ও গায়ক ছিলেন। ভারতের কবিদের মধ্যে অনেকেই গায়কও ছিলেন। জয়দেবের গীত গোবিন্দ, গোবিন্দের গীত। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি কবি ও গায়ক ছিলেন! বাংলার মঙ্গলকাব্য, পাঁচালী, কথকতা প্রভৃতিতে কবিগণ স্ব স্ব রচনা গান করিতেন। অনেক গায়ক নিজে রচনা না করিতে পারায়, অন্যের রচনা গান করিতেন। আধুনিক কালেও অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিগণ গায়কও ছিলেন।

রামায়ণের পর মহাভারত আর একখানি মহাকাব্য। মহাভারতের বক্তব্য বিষয়ও শোককাহিনী। সমগ্র মহাভারতখানি রামায়ণের ন্যায়

গানে জনপ্রসিদ্ধি লাভ না করিলেও, মহাভারতের সার ভাগটুকু যে গীত হইত, তাহা ভগবদ্‌গীতা নাম হইতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। তবে এই যষ্ঠিলক্ষ শ্লোকসমন্বিত সমগ্র মহাকাব্যখানি যে একবারও কথিত বা গীত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ মহাভারতেই বর্ত্তমান। বৈশম্পায়ণ মুনি মহারাজ জন্মেজয়কে সমগ্র মহাভারতখানি শুনাইয়াছিলেন, কারণ "উবাচ" পদের দ্বারা গান করিয়াছিলেন বুঝিলে অন্যায় হইবে।

অতএব আমরা আদিকাল হইতেই দেখিতে পাই যে, শ্লোক বা কাব্য গানেই আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিতেছে।

কাব্যের অপর একটি নাম হইল পদ্য।

ছন্দোমঞ্জরীতে পদ্যের লক্ষণ কথিত হইয়াছে—

পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা।
বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রা কৃতাভবেৎ ॥

পদ্য দুই প্রকারের, বৃত্ত ও জাতি। বৃত্ত অক্ষরসংখ্যাত অর্থাৎ আক্ষরিক ও জাতি মাত্রাপরিমিত অর্থাৎ মাত্রিক।

বাংলা পদ্যে অদ্যাপি এই দুইটি রীতিই প্রচলিত। যেমন, আক্ষরিক :

ক্ষুধিত কণ্ঠের তীব্র তিক্ত আর্ত্তনাদ
আলোকে বাতাসে করে ভস্মাভ বিস্বাদ।

আর মাত্রিক :

তালীবনের মাথায় ঝলে শ্যামল আলিম্পন
কেয়ার গন্ধে দেয়ার শঙ্খে সাদর নিমন্ত্রণ।

পদ্য শব্দ চরণার্থক পদ-শব্দজ। এই জন্য পদ্যের ছত্রগুলিকে পদ বা চরণ বলা হয়।

পদ্য আজন্ম সঙ্গীতেই বিকশিত ও প্রচলিত। এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সঙ্গীতের সহিত নৃত্যের সম্বন্ধও বিশেষ ঘনিষ্ঠ।

সঙ্গীত অর্থে নৃত্য গীত ও বাদ্য বুঝায় বলিয়া, সঙ্গীতশাস্ত্রে পাই—নৃত্য-গীত-বাদ্যস্য শাস্ত্রম।

হেমচন্দ্র সঙ্গীতের অর্থ বলেন—

গীতবাদ্যনৃত্য ত্রয়ং নাট্য তৌর্য্য ত্রিকঞ্চ তৎ।
সঙ্গীতং প্রেক্ষণার্থেঽস্মিন্ শাস্ত্রোক্তি নাট্যধর্ম্মিকা॥

নৃত্য জীবের একটা সহজ বৃত্তি। কাব্য গীত হইতে হইতে, আপনাআপনি তাহাতে নৃত্যও সংযুক্ত হইয়াছে। গায়ক গানের সুরে ও লয়ে তন্ময় হইয়া, তাহার সহজ আনন্দে আপনিই এক সময়ে নাচিয়া উঠে। গানের এ আনন্দ সংক্রামক। শ্রোতার মধ্যেও এই নৃত্যের সংক্রামণ প্রচালিত হয়। শ্রোতাও গানের তালে তালে গায়কের সহিত নাচে।

শ্রোতার দল মুখে না গাহিলে বা উঠিয়া না নাচিলেও, গানের তালে তালে তাঁহারা যে তাল দেন, মাথা নাড়েন, বা বসিয়া বসিয়া দোলেন, এগুলিও নৃত্যের সমপর্য্যায়ভুক্ত।

কারণ, নৃত্যের অর্থ—তালমানরসাশৃত সবিলাস অঙ্গবিক্ষেপ। অঙ্গবিক্ষেপ অর্থ, অঙ্গচালনা। ক্রমশঃ নৃত্যের অর্থ বর্ত্তমানে নাচ বলিতে যাহা বুঝি, তাহাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সঙ্গীতদামোদরে নৃত্যের অর্থ কথিত হইয়াছে—

দেবরুচ্যা প্রতীতো য স্তালমানরসাশ্রয়ঃ।
সবিলাসো হঙ্গবিক্ষেপো নৃত্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥

এবং নৃত্যের কারণ উক্ত হইয়াছে :

গেয়াদুত্তিষ্ঠতে বাদ্যং বাদ্যাদুত্তিষ্ঠতে লয়ঃ।
লয়তানসমারব্ধং ততোনৃত্যং প্রবর্ত্ততে॥

অতএব আমরা দেখিতে পাই, গান হইতে বাদ্য, বাদ্য হইতে লয় এবং লয়-তাল সংযুক্ত হইয়া যে নৃত্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা তাল-

মানরসাশ্রিত হইয়া সবিলাস অঙ্গবিক্ষেপকেই বলা হইয়াছে! এই অঙ্গবিক্ষেপের প্রকার ও রীতিভেদে নৃত্যেরও প্রকার-ভেদ ঘটিয়াছে। অতএব গান শুনিয়া শ্রোতাদের যে অঙ্গবিক্ষেপ হয়, তাহাকেও পণ্ডিতগণ নৃত্যের মধ্যেই গণ্য করিয়া গিয়াছেন।

বিনা সুরে তালে ও লয়ে নৃত্য জন্মেও না, জমেও না। মানবেতর প্রাণিগণের মধ্যেও সহজ নৃত্যবৃত্তি আছে। তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ নৃত্যের প্রেরণা জোগায় শব্দ ও বর্ণময় প্রাকৃতিক লীলা। মানুষের সঙ্গীতেও মানবেতর জীবের প্রাণে নৃত্যোল্লাষ জাগে। এ দৃশ্যও বিরল নহে: সাপ সঙ্গীতের তালে তালে দক্ষিণে বামে দোলে, মৃগ পুচ্ছতাড়না করে, অনেক পাখী পক্ষবিস্তার করিয়া অলসভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সঙ্গীত শোনে আর দোলে।

মানুষকে নাচায় কথা সুর ও তাল। গীতের উচ্ছ্বসিত, উচ্ছলিত ও উদ্বেল আনন্দরস নৃত্যের মধ্যে মুক্তি চায়। নৃত্যও তাই পদ্মের মধ্যে শতদলে বিকশিত হইয়া, সম্পূর্ণরূপে আত্মদান করিয়া ধন্য হয়, পূর্ণ হয় ও সার্থক হয়।

নৃত্যের সঙ্গে পদ্যের এই একাত্মতার দরুণ, গীতের সহিত পদের সম্বন্ধও অবিচ্ছেদ্য। নৃত্যের পদবিক্ষেপে গীত আত্মপ্রকাশ করে বলিয়া গীতের নাম পদ্য।

নৃত্যের অনুষঙ্গী গীত বা কাব্য এই ভাবে পদ্য নামে প্রথম প্রচারিত হইল। পদ্যে চরণার্থক পদই প্রধান বলিয়া, পদজাত ছন্দে বা পদপ্রধান রচনার নাম পদ্য হওয়াই স্বাভাবিক। এখন অর্থব্যাপ্তিতে শ্লোক কবিতা কাব্য ও পদ্য সবগুলিই সমার্থক হইয়া পড়িয়াছে।

নৃত্যের চঞ্চল পদ-লীলায় যে পদ্যের সম্ভব, তাহার আরও প্রমাণ আছে: অমরকোষকার পদ্যের সমনাম বলেন বৃত্ত। ছন্দোমঞ্জরীতেও পদ্য অর্থে বৃত্ত উক্ত হইয়াছে। বৃত্ত শব্দ বৃৎ ধাতু হইতে উৎপন্ন—বৃত

বর্ত্তনে (কবিকল্পক্রম)। ছন্দোমঞ্জরীকার এই বৃত্তকে বলেন তিন প্রকার : সমমর্দ্ধসমং বৃত্তং বিষমঞ্চেতি তত্রিধা।

অর্থাৎ সম, অর্দ্ধসম ও বিষম বৃত্ত। নৃত্য সরল রেখায় হয় না, নৃত্যের গতি সর্ব্বদাই বক্র, কাজেই বৃত্তাকার। এ বৃত্ত কখনও সম, কখনও অর্দ্ধসম, কখনও বা বিষম। এই বৃত্তাকার বা মণ্ডলাকার নৃত্য হইতেই পদ্যের নাম যে বৃত্ত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

নৃত্য যে প্রাচীনকালেও মণ্ডলাকারে হইত তাহার প্রমাণ পাই উৎকলকলিকায় : কুলালচক্রপ্রতিমং মণ্ডলং পঙ্কজাঙ্কিতং।
রাসের অপর নাম হল্লীষ। হল্লীষ অর্থে জটাধর বলেন—

স্ত্রীণাং মণ্ডলিকানৃত্যং।

হেমচন্দ্রও একমত। তিনি বলেন—

মণ্ডলেন তু যন্নৃত্যং স্ত্রীণাং হল্লীষকন্তু তৎ।
গোপীনাং মণ্ডলীনৃত্যবন্ধে হল্লীষকং বিদুঃ॥

অতএব আমরা পাইতেছি স্ত্রী ও পুরুষের সম্মিলিত মণ্ডলাকার নৃত্য।

পদ্যের বিভিন্ন ছন্দের নামেও সেই জন্য আমরা নৃত্যের অর্থাৎ অঙ্গবিক্ষেপেরই পরিচয় পাই। সংস্কৃত ছন্দের নামগুলির আলোচনা করিলে দুইটি বিষয় আমাদের নিকট অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়। প্রথমতঃ, নারীর বিভিন্ন রূপ ক্রিয়া বা মনোভাব : জঘনচপলা, ত্বরিতগতি, বেগবতী, দ্রুতবিলম্বিত, লীলাখেল, মন্দাক্রান্তা, রথোদ্ধতা, স্বাগতা, কন্যা, সতী, শশিবদনা, কুমারললিতা, মত্তা, মনোরমা, সুমুখী, প্রহর্ষিণী, রুচিরা, চণ্ডী, মঞ্জুভাষিণী, বসন্ততিলক, অপরাজিতা, লোলা, চকিতা, মদনললিতা, বাণিনী, হারিণী, ভারাক্রান্তা, উদ্দাম প্রভৃতি বহু।

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন মানবেতর প্রাণিদিগের গতি ক্রিয়া বা ক্রীড়ার অনুকরণদ্যোতক নাম : হরিণলতা, মত্তমাতঙ্গলীলাকর, শার্দ্দূলবিক্রীড়িত,

অশ্বললিত, ভুজঙ্গপ্রয়াত, ভুজঙ্গসঙ্গতা, মৃগী, মত্তময়ূর, শ্যেনী, ভ্রমর-বিলসিতা, কলহংস, মৃগেন্দ্রমুখ, ঋষভগজবিলসিত, গরুড়রুত, হরিণী, বনকোকিল, হংসী, ক্রৌঞ্চপদা, ব্যাল, শঙ্খ, হরিণপ্লুতা ইঃ।

এ দুইটি ছাড়া নদ নদী জল পুষ্প ও তরুলতার নামেও বহু ছন্দ আছে: মন্দাকিনী, স্রগ্ধরা, স্রগ্বিণী, বাতোর্ম্মি, জলোদ্ধতগতি, মদিরা, সোমরাজী, পুষ্পিতাগ্রা, শিখরিণী, বংশপত্রপতিত প্রভৃতি।

এই সব নাম হইতে ইহা অনুমান করা অন্যায় হইবে না যে, উক্ত পদার্থগুলির রূপ ক্রিয়া বা বিশেষ ভাবের অনুকরণে ও অনুসরণেই এই সব নৃত্যের রচনা ও নামকরণ হইয়াছিল। বিভিন্ন নৃত্যের পদসঞ্চালনে যে সব বিভিন্ন ছন্দ জাগিয়াছিল, সেই সব ছন্দকে সেই যুগের কবিরা পদ্যের ছন্দেও বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বেশ মনে হয়, ছন্দের নামকরণ হইবার আগে, নৃত্যের নামেই ইহারা সবিশেষ পরিচিত ছিল। এখনও আমরা শুনি এবং দেখি, আরতিনৃত্য, পূজানৃত্য, ব্যাধনৃত্য, সাপুড়ে নৃত্য, ইন্দ্রনৃত্য প্রভৃতি। অর্থাৎ বিশেষ 'পরিচিত' কোনও জীব ক্রিয়া বা ভাবের অবলম্বনে নৃত্যগুলি গঠিত হয় এবং তাহার স্বরূপটি জনসাধারণের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যে, মূলের নামেই সেই নৃত্যের নামকরণ হয়। দেহের বিভিন্ন অঙ্গহারে অর্থাৎ অঙ্গসঞ্চালনে ও বিক্ষেপে যেমন বিভিন্ন নৃত্যের জন্ম, তেমনি অক্ষর বা মাত্রার বিভিন্ন যতিতে বিভিন্ন ছন্দেরও সম্ভব হইয়াছে।

পদ্যের ছন্দ নৃত্যের ছন্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়াই, পদ্যের ছন্দের নামও বিবিধ পশুপক্ষী ও নারীশ্রীর নামে অনুনামিত। পদ্য পদজাত অর্থাৎ নৃত্যজাত না হইলে, ও-ভাবে নিশ্চয় তাহাদের নামকরণ হইত না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবিতার নাম পদ্য ও বৃত্ত। ইংরাজীতে কবিতার নাম Verse. Verseএর উৎপত্তি ল্যাটিন Verto হইতে। Verto-র অর্থ আবর্ত্তন। ল্যাটিন Verto এবং সংস্কৃত বৃত্ত—সমার্থক, অর্থাৎ

বর্ত্ততে। Verto ও বৃত্তের সৌসাদৃশ্য শুধু রূপেই নয়, প্রকৃতিতেও। Vert ও বৃৎ এই ধাতু দুইটি একই, স্থানীয় উচ্চারণবৈষম্যে এইরূপ পৃথক্ মনে হইতেছে মাত্র।

বৃত্তের অর্থ মণ্ডলাকারে আবর্ত্তন, Verto-র অর্থও মূলতঃ তাই। প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যে দেবতার উদ্দেশ্যে Choral Danceএর যে উল্লেখ পাই, শ্রীমদ্‌ভাগবতে আমরা তাহার অনুরূপ নৃত্য পাই হল্লীষে অর্থাৎ রাসনৃত্যে। ফলতঃ Choral Dance ও রাস বা হল্লীষ একই জাতীয়। "মণ্ডলেন তু যন্নৃত্যং স্ত্রীণাং হল্লীষকন্তু তৎ"—হেমচন্দ্র। এই মাণ্ডলিক নৃত্যই প্রাচীন গ্রীসের Choral Dance.

সংস্কৃত পদ শব্দের অনুরূপ ইংরাজীতেও কবিতার চরণের নাম Foot. সুতরাং এখানেও নৃত্যের ছন্দকে কথায় বন্দী করিবার কালেই যে কবিতার চরণের নামে Foot শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ করিবার বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না।

দুই চরণ বিশিষ্ট একটি শ্লোকের নাম ইংরাজীতে বলে—Couplet. Couplet-এর অর্থ Oxford Dictionaryতে পাওয়া যায়, A pair of successive lines of verse আর Couplet উৎপন্ন হইয়াছে Couple শব্দ হইতে। Couple-এর অর্থ ইংরাজ শাব্দিক বলেন—A Pair of Partners in Dance, এখানেও Couplet নৃত্যের নেপথ্যভূমির কথাই সূচিত করিতেছে, যদিও et-তদ্ধিতে বিশেষ কিছুই পার্থক্য ঘটায় নাই।

ইংরাজীতে Stanza-র বর্ত্তমান অর্থ দুই, চারি বা ততোধিক মিল-শেষ চরণের একত্র সমাবেশ অর্থাৎ স্তবক। ল্যাটিন Stantia ধাতু হইতে Stanza শব্দ উৎপন্ন। Stantiaর অর্থ Stand অর্থাৎ দাঁড়ান, থামা। নৃত্যকালে মাঝে মাঝে নর্ত্তকদের কিয়ৎক্ষণ করিয়া বিরাম করার রীতি অদ্যাপি বর্ত্তমান। নৃত্যের এই বিরাম বা যতিই, ছন্দেরও যতিরূপে

ব্যবহৃত হইতে লাগায়, কবিতাও stanza বা স্তবকে বিভক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। গানের সুর ও লয়ের স্বাতন্ত্র্যে, সব নৃত্যের যতি যেমন এক স্থানীয় বা এককালীন নয়, তেমনি সব পদ্যের বিভাগও এক রকম হয় নাই ঃ দুই চারি ছয় আট এমন কি, দশ চরণে পর্য্যন্ত এক একটি stanza নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পদ্যে এ বিভাগ প্রথমে হইয়াছিল গীতের সুর ও নৃত্যসৌকর্য্যের জন্য। ক্রমশঃ সব পদ্য গীত না হইলেও, পদ্যের নানাবিধ স্তবকবিভাগের অনুকরণে, পরবর্ত্তী কবিগণ নিজ নিজ খেয়াল ও খুশীতে পদ্যে stanza বিভাগ করিতে লাগিলেন এবং এখনও সেই প্রথাই প্রচলিত। ইচ্ছামত চরণসমবায়ে স্তবকবিভাগ সাধারণ কবিতাতেই সম্ভব, কারণ সেগুলি গেয় নয়, কিন্তু গানে তাহা চলে না, কারণ গানের স্তবকবিভাগ সুরানুগামী।

রামায়ণ-মহাভারত হইতেই পুরাণগুলি অনুপ্রাণিত। ক্রমশঃ উক্ত দুই মহাকাব্য এবং পুরাণগুলি হইতে পরবর্ত্তী কালে যে সব বিবিধ কাব্য ও খণ্ডকাব্যের উৎপত্তি, তাহা সহজেই অনুমেয়। আরও পরে, পূর্ব্বোক্ত মহাকাব্য কাব্য খণ্ডকাব্যাদির বিশেষ বিশেষ অংশের প্রকাশনায় নাটকের উৎপত্তি।

বিষ্ণুপুরাণের রাসোৎসব বর্ণনা হইতে প্রতীত হয় যে কাব্যপুরাণাদি অবলম্বনেই নাট্যের উৎপত্তি (বিষ্ণুপুরাণ, ৫ম অংশ, ১৩শ অধ্যায় ২৪—৩০ শ্লোক)।

নাটক শব্দটি নটধাতু হইতে উৎপন্ন। নট নর্ত্তনে। নট শব্দের অর্থ নর্ত্তক। নাটকের শৈশবাবস্থায় তাহাতে যে কেবল নৃত্য-গীতেরই প্রাধান্য ছিল, এ অনুমান ভুল নয়। পরে, নাটকান্তর্গত পাত্র-পাত্রী-দের মুখে কথা দেওয়ার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই কথাগুলি বিনা নৃত্যগীতে কথিত হইত বলিয়া, এই রচনারীতির নামকরণ হইল গদ্য ঃ গদ ভাষণে।

ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানে নাটকের অর্থ—গদ্যপদ্যপ্রাকৃতভাষাময় গ্রন্থবিশেষ। সঙ্গীতদামোদর গ্রন্থেও নাটকের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ নাটকীয় লক্ষণযুক্ত গ্রন্থের উদাহরণে উক্ত হইয়াছে—

মুরারিকবেরনর্ঘরাঘবং ভবভূতেরুত্তরচরিতং কালিদাসস্যাভিজ্ঞানশকুন্তলঞ্চেত্যাদি।

অতএব নাটকের উৎপত্তি হইতেই, গদ্য পদ্য দুইটি বিশিষ্ট রচনারীতির প্রচলন যেমন আরম্ভ লইল, তেমনি প্রাকৃত ভাষাও সাহিত্যের পংক্তিতে স্থানমর্য্যাদা লাভ করিল।

কাব্যের বিষয়বস্তুকে সর্ব্বজনবোধ্য করিয়া প্রকাশ করার ইচ্ছা হইতেই নাটকের জন্ম। এ জন্য কবি ও নাট্যকাররূপে আমরা সেকালের শ্রেষ্ঠ কবিগণকেই পাই যেমন ভবভূতি কালিদাস প্রভৃতি। আধুনিক কালেও শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকাররূপে আমরা পাইয়াছি মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীগণকে।

নাটকেই গদ্য রচনা প্রথম সাহিত্যে স্থান পাইল, তৎপূর্ব্বে পদ্যই ছিল সাহিত্যের একমাত্র বাহন। নাটকের পরেই কেবল গদ্যরচনায় সাহিত্যের সৃষ্টিও চলিতে লাগিল, যেমন হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, কাদম্বরী প্রভৃতি।

এইস্থলে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সাহিত্যে গদ্যরচনা প্রবর্ত্তনের পর হইতেই, কাব্যপুরাণবহির্ভূত বিষয় লইয়াও, প্রকৃত কথাসাহিত্যের শুভসূচনা হইল।

এইভাবে, পদ্য, গদ্য ও পদ্য-গদ্যমিশ্রিত এবং প্রাকৃত ভাষার সমন্বয়ে যে সব রচনা হইতে লাগিল, সেই রচনাবলীর ব্যাপক সংজ্ঞারূপে 'সাহিত্য' সংজ্ঞাটির উৎপত্তি হইল।*

---

* ২৬শে নভেম্বর ১৯৪৪, বর্দ্ধমানে রবিবাসরীয় সভায় পঠিত

মেঘদূতে নারী

কালিদাসের কাব্যে সর্ব্বপ্রথমেই নজরে পড়ে, তাঁহার নরনারীর সহিত প্রকৃতির নিবিড় ও অচ্ছেদ্য সংযোগ। কবির কাব্যোক্ত চরিত্রের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ক্রিয়ার সহিত প্রকৃতিও যেন সক্রিয়। প্রকৃতি তাঁহার চরিত্রের সহিত সর্ব্বদা সজাগ ও তাহাদের প্রতি সতত সহানুভূতিশীল। প্রকৃতি ও চরিত্র যেন একাত্ম। প্রকৃতি ও চরিত্রকে এমনি ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত অনুভব করিয়া, কবি রমণী ও রমণীয়ের প্রতীক-রূপে চেতন এবং অচেতন পদার্থকে পরস্পরের পরিপোষক ও দ্যোতকরূপে সমান ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য নারীর রূপ-সজ্জায় পাই প্রকৃতির দান, নারীর বর্ণনাতেও দেখি প্রকৃতিই তাঁহার একমাত্র সহায়। কবি কালিদাসের সমগ্র কাব্যমণ্ডলে সাধারণ ভাবে এই তত্ত্বটিই সমুজ্জ্বল, মেঘদূতে এটি প্রস্ফুটতর। মানুষের তৈরী কোনও পদার্থের দ্বারা কবি নারীর সজ্জা বা সত্ত্বা কোথাও বিশেষ কল্পনা করেন নাই।

দুই একটি মাত্র উদাহরণ দিতেছি : নারীর রূপসজ্জায় দেখি—

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাং ॥—২।২

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীর রূপবর্ণনায় পাই—

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।

শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্‌ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥—২।২১

বালিকাদের ক্রীড়াতেও প্রকৃতির সহযোগিতা :

মন্দাকিন্যাঃ সলিলশিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভিঃ
মন্দারাণামনুতটরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ।
অন্বেষ্টব্যৈঃ কনকসিকতা মুষ্টিনিক্ষেপ গূঢ়ৈঃ
সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমরপ্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ ॥—২।৬

নারীর প্রসাধনে রূপে ও ক্রীড়ায় যেমন প্রকৃতি অত্যাজ্য, প্রকৃতির বর্ণনাতেও তেমনি নারী অপরিহার্য্য :

নির্ব্বিন্ধ্যার পরিচয়ে কবি বলিতেছেন—

বীচিক্ষোভ স্তনিতবিহগশ্রেণিকাঞ্চীগুণায়াঃ
সংসর্পন্ত্যাঃ স্খলিতসুভগং দর্শিতাবর্ত্তনাভেঃ।
নির্ব্বিন্ধ্যায়াঃ পথিভব রসাভ্যন্তরঃ সন্নিপত্য
স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমোহি প্রিয়েষু ॥ —১।২৮

যক্ষ মেঘকে এত কথা বলিতেছে, অথচ মেঘ কোন কথারই উত্তর দেয় না। যক্ষ নিরুত্তর মেঘের উপর সেজন্য বিরক্ত নয়; সে নিজেই তাহার মৌনব্রতের কারণ প্রদর্শন করিতেছে : আমি জানি সাধু ব্যক্তিরা বৃথা বাক্যব্যয় করেন না, তাঁহারা কার্য্যের দ্বারা কথার প্রত্যুত্তর দেন অর্থাৎ যাচকের অভীষ্ট পূরণ করিয়াই তাঁহারা কথার জবাব দিয়া থাকেন। তুমিও তাই যাচক চাতকদিগকে নিঃশব্দেই জলদান কর :

নিঃশব্দোঽপি প্রদিশসি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্যঃ
প্রত্যুক্তংহি প্রণয়িষু সতামীপ্সিতার্থক্রিয়ৈব ॥—২।৫৩

শিপ্রার সুশীতল প্রত্যূষবায়ু সেও ব্যর্থ নয়, বিশালাবাসিনী নারীদের অঙ্গসেবার জন্যই যেন সে বয় :—

দীর্ঘীকুর্ব্বন্ পটু-মদকলং কূজিতং সারসানাং
প্রত্যূষেষু স্ফুটিত কমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ।
যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরতগ্লানিমঙ্গানুকূলঃ
শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনাচাটুকারঃ ॥—১।৩১

উপর হইতে কৈলাসের কোলে অলকা নগরী কেমন দেখিতে? যেন একজন বিলাসিনী রমণী :

তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িনইব স্রস্তগঙ্গাদুকূলং
ন ত্বং দৃষ্ট্বা ন পুনরলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিন্।
যা বঃ কালে বহতি সলিলোদগার মুচ্চৈর্বিমানা
মুক্তাজালগ্রথিতমলকং কামিনীবাভ্রবৃন্দং ॥—১।৬৩

ইত্যাদি। কালিদাসের কাব্য হইতে এ জাতীয় উদাহরণ উদ্ধরণ করিতে হইলে, সমগ্র গ্রন্থই উদ্ধৃত করিতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মেঘদূতে প্রকৃতির সহিত মানব জীবনের এবম্বিধ একাত্মতার পরিচয় আমরা প্রচুর পরিমাণেই পাই।

মেঘদূতে আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সুন্দরী তরুণীর সহিত যাহার কোন সম্বন্ধ নাই বা যাহা সুন্দর নয়, এমন কোনও চেতন বা অচেতন পদার্থকে কবি তাঁহার এই কাব্যে কোথাও স্থান দেন নাই। মেঘদূতের নদনদী গিরিপর্ব্বত জনপদের প্রায় সবই কোন না কোন সুন্দরীর সহিত সংযুক্ত।

মেঘদূতে বর্ণিত অতীত ইতিকথার সঙ্গেও অধিকাংশ স্থলেই রমণীর উল্লেখ বিদ্যমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গ্রন্থের প্রথম শ্লোকেই আমরা পাই রামগিরি পর্ব্বত। এই রামগিরিতে যখন যক্ষ নির্ব্বাসিত হইয়াছে, তখন স্থানটি খুবই ভীষণ; অন্ততঃ মনোরম নিশ্চয়ই নয়। কবি রামগিরির কোন পরিচয়ই দেন নাই। কেবল এখানে বনবাসী রামচন্দ্র কিছু-দিন বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই, কবি বলিতেছেন—এখানে জনকতনয়া

স্নান করিয়াছিলেন, সে জন্য এখানকার জল পবিত্র ও পুণ্যময়। কবি জনকতনয়ার কথা বলিলেন, তাঁহার স্নানের দ্বারা পুণ্যোদকের কথাও বলিতে ভুলিলেন না, কিন্তু জনকতনয়ার স্বনামধন্য স্বামী বা জনকতনয়ার পাদস্পর্শ দ্বারাও যে রামগিরি পুণ্যগিরি বা তাঁহার পাদোদকেই পুণ্যোদক হইয়াছে—একথাটী কবি উল্লেখ করিলেন না। সুন্দরী তরুণী জনকতনয়া সেখানে নিত্য অবগাহন করিয়া উঠিতেন, রামগিরির কথায় তাই কবির মনে সত্বস্নাতা রূপসীর সত্বমার্জ্জিত অপরূপ সেই রূপশ্রীর ছবিই শুধু সমুদিত হইয়াছে। কবি এতদ্বারা প্রিয়াবিরহকাতর যক্ষের মনেরই যে অনুসরণ করিয়াছেন, ইহা সহজেই অনুমেয়।

এইরূপ নীচৈঃ দেবগিরি আম্রকূট কৈলাস প্রভৃতি পর্ব্বত, উজ্জয়িনী দশপুর দশার্না বিশালা প্রভৃতি নগর, রেবা শিপ্রা নির্ব্বিন্ধ্যা বেত্রবতী প্রভৃতি নদী—কোনটিকেই কবি অ-রমনীয় ভাবে দেখেন নাই, বরং বলা যাইতে পারে, কবির বর্ণনায় পুরুষের সম্বন্ধই বিশেষ ভাবে বর্জ্জিত হইয়াছে।

কালিদাস সৌন্দর্য্যের পূজারী, রমণীয়তার উপাসক, তাই তাঁহার কল্পনায় রমণী তাহার অনন্ত সৌন্দর্য্যের বিশ্বরূপ লইয়া চেতনে ও অচেতনে, মানুষে ও প্রকৃতিতে, সমভাবে তাহার রমণীয়তা পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়া, উভয়কেই একাত্ম এবং অভিন্ন করিয়া অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছে।

নারীর এই বিশ্বরূপের আমরা প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই, যক্ষ যখন প্রকৃতির মধ্যে তাহার প্রিয়তমার সাদৃশ্য খুঁজিয়া ফিরিয়া বলিতেছে—

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি।—২।৪৩

কি-সংস্কৃত কি-বাংলা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে বাস্তবতাকে আদর্শের ভারে ন্যুব্জ করার প্রচেষ্টায়, মানুষ হয় দেবতা, নয় দানব হইয়া দাঁড়াইয়াছে—মানুষ মানুষ হইয়া বিশেষ কোথাও দেখা দেয় নাই। তাহার ফলে সেকালের মানুষের রীতিনীতি আচারব্যবহার ক্রিয়াকার্য্যের আমরা সম্যক ও সঠিক পরিচয় সর্ব্বত্র পাই না। হয়ত সে কালের সমাজ ও যুগ, আদর্শই চাহিতেন যে জন্য অবং প্রাচীন সাহিত্য বিশেষরূপে আদর্শপন্থী। তবে সে আদর্শবাদ যে একেবারে বস্তুবর্জ্জিত, তাহাও বিশ্বাস হয় না। কারণ কবির কল্পনা দেশকালসমাজ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব কখনও সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। কালের স্পর্শ ও পরিচয়ে কবির নিজের জীবন যেমন গড়িয়া উঠে, তাঁহার চিন্তাও তেমনি সে প্রভাব হইতে কখনই সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে না। কাজেই, মেঘদূতে কবিকল্পনার অতিরঞ্জন যতই থাকুক, তাহার মধ্যে তৎকালীন জীবন সমাজ চিন্তা ও আচার-ব্যবহারের খানিকটা যে সত্য পরিচয় আছেই, তাহা নিশ্চিত। মানুষের মধ্যে দেবত্বের আরোপই যখন সেকালে একমাত্র অনুভাব্য ছিল, তখন মানুষের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ গরিষ্ঠ ও ভূয়িষ্ঠ তাহাকেই যে কবিগণ দেবত্ব নামে অভিহিত করেন নাই, ইহাই বা কে বলিতে পারে? মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ বিকাশকেই কবিগণ যে তখন দেবত্ব বা আদর্শ বিবেচনা করিতেন, এ অনুমানও বোধ হয় অসঙ্গত নয়।

যিনি পরবর্ত্তীকালে সম্রাট বিক্রমাদিত্য নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন, ঐতিহাসিকগণ বলেন, কবি কালিদাস সেই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালে জীবিত ছিলেন এবং খুব সম্ভব তাঁহার সভাকবিও ছিলেন। গুপ্ত যুগ ভারতের এক স্বর্ণযুগ। সম্রাটের গুজরাট বিজয়ের পর উজ্জয়িনী তৎকালে শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতা ও বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। সেখানকার অধিবাসীরাও সুখে ও শান্তিতে নিশ্চিন্ত হইয়া বসবাস

করিত। সুতরাং মেঘদূতে বর্ণিত বিভিন্ন স্থানে সমাজে জীবনে ও আচারব্যবহারে যে ভাবনাহীন অকুতোভয়, প্রাচুর্য্য ও বিলাসপ্রিয়তার পরিচয় পাই, তাহাকে অত্যুক্তিই বা বলি কি করিয়া? বর্ত্তমান কালের আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক, সর্ব্ববিধ দুরবস্থার ও হীনতার সঙ্গে তুলনা করিলে, মেঘদূতের তথা কালিদাসের কাল স্বপ্ন বা কবি-কল্পনায় অতিরঞ্জিত মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক, সন্দেহ নাই। তবে গুপ্ত-যুগের সুখ-সমৃদ্ধির ঐতিহাসিক সত্যের সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদের নিকট সে কাল অভাবনীয় হইতে পারে, কিন্তু একেবারে অলীক বা নিছক কবি-কল্পনা বলিয়া মনে হইতে পারে না।

যাহাই হউক, মেঘদূতের ঐতিহাসিক তত্ত্ব আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হই নাই। মেঘদূতের নারীচরিত্রগুলির আলোচনার পূর্ব্বে প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করিয়াই, পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছি মাত্র।

মেঘদূতে আমরা অষ্টাদশ প্রকারের নারীর সাক্ষাৎ পাই :

(১) পথিকবনিতা—১।৮
(২) সিদ্ধাঙ্গনা—১।১৪, সিদ্ধদ্বন্দ্ব—১।৪৫
(৩) জনপদবধূ—১।১৬
(৪) অমরমিথুন—১।১৮
(৫) বনচরবধূ—১।১৯
(৬) পণ্যস্ত্রী—১।২৫
(৭) পুষ্পলাবী—১।২৬
(৮) পৌরাঙ্গনা—১।২৭
(৯) ললিতবনিতা—১।৩২, ২।১
(১০) বেশ্যা—১।৩৫
(১১) অভিসারিকা—১।৩৭

(১২) খণ্ডিতা—১।৩৮
(১৩) কিন্নরী—১।৫৬
(১৪) ত্রিদশবনিতা—১।৫৮, ১।৬১
(১৫) বারমুখ্যা—২।১০
(১৬) অলকার নারী—২।১১
(১৭) কন্যা—২।৬
(১৮) কান্তা, যক্ষের পত্নী—২।১৪

(১) পথিকবনিতা ঃ

পথিকবনিতার প্রচলিত সমনাম প্রোষিতভর্তৃকা বা বিরহিনী! সংস্কৃত সাহিত্যে বিরহ একটা বিরাট আসন দখল করিয়া আছে। আলঙ্কারিকগণ এজন্য বিরহিনী নারীকে এক প্রকার নায়িকারূপেই গণ্য করেন। সেকালেও, একালের মতই, ব্যবসা-বাণিজ্য রাজকার্য্য রাজ-রোষ শিক্ষা প্রভৃতি নানা কার্য্যব্যপদেশে স্বামীগণের প্রবাসে এমন কি, বিদেশেও গমন করার রীতি ছিল। তবে একালের মত সস্ত্রীক বা সপরিবারে যাওয়ার রেওয়াজ তখন অবশ্য ছিল না। যে সব কার্য্যের জন্য প্রবাসের প্রয়োজন হইত, সে সব কার্য্য বর্ষাকালে তেমন সুসম্পন্ন হইতে পারিত না বলিয়া, প্রবাসীরা বর্ষার পূর্ব্বেই গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। এজন্য আষাঢ়ের প্রথমে গগনে নবমেঘের সঞ্চার হইলেই প্রবাসীদের চিত্ত যেমন গৃহের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিত, প্রোষিতভর্তৃকাদের অন্তরও তেমনি প্রিয়তমের মিলনাশায় নাচিয়া উঠিত, এখন যেমন শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে আমাদের জীবনে হয়। তখন সংবাদ আদান-প্রদানেরও কোন সুব্যবস্থা ছিল না, কাজেই ইহাকে-উহাকে ধরিয়া দৌত্য বা ডাকঘরের কাজ করাইয়া লওয়ার রীতিও ছিল সুপ্রচলিত।

শৃঙ্গারতিলকে আছে—

বাণিজ্যেণ গতঃ স মে গৃহপতির্বার্ত্তাপি ন শ্রূয়তে—১২

প্রিয়জনের বিরহে প্রিয়জনের অন্তরবেদনা যেমন দুঃসহ, তেমনি উভয়েরই পরস্পরের বার্ত্তার জন্ম উৎকণ্ঠাও স্বাভাবিক। এই চিরন্তন বেদনা ও উৎকণ্ঠাই মেঘদূত কাব্যের গোমুখী। বিরহিনীর অশ্রুসজল বেদনা-ব্যথায় সংস্কৃত সাহিত্য পরিপূর্ণ; কিন্তু বিরহীর মর্ম্মবেদনাও যে অনুরূপ তীব্র এবং সার্ব্বজনীন চিরন্তন, তাহা পৃথিবীর সাহিত্যে এক মাত্র কবি কালিদাসই তাঁহার মেঘদূতে মৃত্যুঞ্জয়ী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

মনু বলিয়াছেন, কেবল স্বামীর প্রীতিবিধান হেতুই নারীর লজ্জা ও প্রসাধনের প্রয়োজন। কাজেই সাধ্বী পতিব্রতা রমণীরা স্বামিবিরহ কালে কোনও রূপসজ্জা বা প্রসাধন করিতেন না। মেঘদূতেও আছে—পথিক বনিতাগণ কোনও বেশভূষা করিতেন না, মলিন বসনে থাকিতেন, চুলে তৈল দিতেন না, খোঁপা না বাঁধিয়া একবেণী হইয়া থাকিতেন ইত্যাদি।

কবি বলেন—বিরহিনীরা দিবসগণনাতৎপরা, শিশিরমথিতা পদ্মিনীর ন্যায় অন্যরূপা, অবনীশয়নে উন্নিদ্র হইয়া নিশাযাপনে কৃশ এবং সতত উৎকণ্ঠিত। *

বিরহিনী পরিমিতকথা ও সহচরহীন চক্রবাকীর মত একা। প্রবল অশ্রুস্রোতে তাঁহার চক্ষু দীপ্তিহীন, অবিরত শুষ্ক নিঃশ্বাসে অধরোষ্ঠ বিবর্ণ এবং লম্বা রুক্ষ অলকে ঢাকা হস্তন্যস্ত মুখচন্দ্র জ্যোতিহীন। প্রবাসী পতির নিরাপত্তার নিমিত্ত কখনও সে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনানিরতা, কখনও কল্পনায় বিরহক্ষীণ পতির চিত্রঅঙ্কনে নিমগ্না, কখনও আবার পিঞ্জরাবদ্ধ

---

* উৎকণ্ঠার প্রকৃত অর্থ :

রাগে ত্বলব্ধবিষয়ে বেদনা মহতী তু যা।
সংশোষনী তু গাত্রাণাং তামুৎকণ্ঠাং বিদুর্বুধাঃ॥

বাংলায় কিন্তু এ শব্দের অর্থ কিঞ্চিৎ লঘু হইয়া পড়িয়াছে।

গৃহসারিকার সহিত প্রিয়তমের আলোচনায় ব্যস্ত। কখনও সে বীণা লইয়া প্রিয়তমের নামসংযুক্ত স্বরচিত গানগুলি গাহিবার জন্য প্রাণপণে বারংবার চেষ্টা করিতেছে, পারিতেছে না—গানের কথা ও সুর সব ভুলিয়া গিয়া চোখের জলে বীণাটিকে ভিজাইয়া তুলিতেছে। দুয়ারের কোণে প্রথম দিন হইতে প্রত্যহ এক একটি করিয়া ফুল রাখিয়া সে বিরহ দিবস গণনা করে এবং রাত্রে শয্যার একান্তে, প্রাচীমূলে হিমাংশুর শেষ কলাটির মত, চুপটি করিয়া শুইয়া থাকে। তাহার শয়নাগারের জালমার্গ পথে যখন জ্যোৎস্নার প্লাবন আসে, তখন সে অতীত সুখের মিলন রজনী স্মরণ করিয়া, মেঘকজ্জল দিবসের স্থলকমলিনীর মত, না-জাগ্রত না-ঘুমন্ত অবস্থায় সারারাত্রি বেদনায় ছট্‌ফট্ করে। জাগরণে দেখা না পাইয়া সে স্বপ্নে প্রিয়তমকে পাইবার আশায় নিদ্রার কত না আরাধনা করে, কিন্তু অশ্রুস্রোতে তাহার নিদ্রাও কোথায় ভাসিয়া যায়!

(২) সিদ্ধাঙ্গনা :

অমরকোষে আছে, সিদ্ধগণ দেবযোনি বিশেষ। ভরত বলেন—স তু অণিমাদি গুণোপেতো বিশ্বাবসু প্রভৃতিঃ। ইহারা খুবই নিরীহ এবং সরল প্রকৃতির জীব। সিদ্ধাঙ্গনাগণ চকিতনেত্রে উন্মুখী হইয়া আষাঢ়ের নবীন মেঘকে সন্দর্শন করিয়া মনে করেন, পবনে যেন গিরিশৃঙ্গ উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। নীচৈঃ পর্ব্বতের শিখরে বীণাবাদনরত সিদ্ধদম্পতিগণ, মেঘ আসিতেছে দেখিলেই জলকণাপাতের ভয়ে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়ান।

(৩) জনপদবধূ :

মেঘদূতে পল্লীবধূ বা কৃষকরমণী অর্থে জনপদবধূ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভ্রূবিলাসে অনভিজ্ঞা প্রীতিস্নিগ্ধ লোচনে সন্তঃ সীরোৎকর্ষণ-সুরভিত মালভূমির উপর দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে ইহারা নবমেঘের দিকে চাহেন, কারণ মেঘই একমাত্র কৃষিফলদাতা।

(৪) অমরমিথুন:

পরিপক্ক আমের পাণ্ডুবর্ণে আম্রকূট পর্ব্বতের শিখরদেশ পাণ্ডুর। তাহার উপর স্নিগ্ধবেণীসবর্ণ অর্থাৎ নিবিড়কৃষ্ণ কেশের একটি বেণীর মত লম্বা কালো মেঘখানি যখন আসিয়া পড়ে, তখন আকাশচারী অমর দম্পতিরা মনে করেন—মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তার পাণ্ডুঃ, পাণ্ডুবর্ণ স্তনের যেন শ্যামল বৃন্ত।

(৫) বনচরবধূ:

আম্রকূট পর্ব্বতের তরুকুঞ্জগুলি বনচরবধূদিগের দ্বারা উপভুক্ত অর্থাৎ আম্রকূট পর্ব্বতের তরুকুঞ্জগুলিই বনচরবধূদের উপভোগের স্থান। ইহাদের সম্বন্ধে কবি এতদধিক আর কিছুই বলেন নাই।

আম্রকূট পর্ব্বতের অপর নাম অমরকণ্টক। অমরকণ্টক হইতে রেবা উদ্ভূত। মধ্যপ্রদেশের বর্ত্তমান জব্বলপুরের সন্নিকটে মিকুল নামে এক গিরিশ্রেণী আছে, আম্রকূট বা অমরকণ্টক ইহারই একটি অংশ। এই মিকুল গিরিশ্রেণীর অধিত্যকাকে গোণ্ডওয়ানা (GONDWANA) (গোণ্ড-বন) কথিত হইত এবং এখনও ইহার কিয়দংশ গোণ্ডওয়ানা নামে সুপরিচিত। গোণ্ডওয়ানা গোণ্ডবন-এর অপভ্রংশ, ইংরাজী নাম। অদ্যাপি এখানে গোণ্ড অর্থাৎ গোঁড় নামে এক অতিপ্রাচীন অনার্য্য জাতি বাস করে। ইহাদের নামানুসারেই এই গোণ্ডবন বা গোণ্ডওয়ানা। সুতরাং কবি আম্রকূট পর্ব্বতে যে বনচরবধূদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি বিদ্যমান। ছোটনাগপুর, সিংহভূম প্রভৃতি অঞ্চলে অদ্যাপি দেখা যাইবে, অনার্য্য জাতিরা পর্ব্বতের অধিত্যকাতেই বাস করে, সুতরাং তাহাদের নৃত্য-গীত, আমোদ-প্রমোদ সব উপরের তরুকুঞ্জেই হইয়া থাকে।

প্রাচীন সাহিত্যে মেখল গিরিশ্রেণীর নাম পাওয়া যায়। কথিত হয় এই মেখল হইতেই নর্ম্মদা উদ্ভূত। বর্ত্তমান মিকলকে মেখলের অপভ্রংশ

অনুমান করিলে কোনও অন্যায় হইবে না, কারণ রেবারই অন্য নাম নর্ম্মদা : রেবাতু নর্ম্মদা সোমোদ্ভবা মেখলকন্যকা—অমরকোষ। মহ-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বিষ্ণুসংহিতার ৮৫ অধ্যায়ে পাওয়া যায়—পুষ্করে স্নানমাত্রতঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ পূতো ভবতি। এবমেব গয়াশীর্ষে। অক্ষয়বটে। অমরকণ্টক পর্ব্বতে।

অতএব আম্রকূট অমরকণ্টক মেখল এবং মিকুল একই পর্ব্বত, যাহা হইতে রেবা বা নর্ম্মদা উদ্ভূত। আর এই আম্রকূট পর্ব্বতে যাহাদিগকে বনচরবধূ বলা হইয়াছে, তাহারা গোঁড়দের বধূ।

(৬) পণ্য-স্ত্রী :

দশার্ণ দেশের সুবিখ্যাত রাজধানী বিদিশার উপকণ্ঠে, নীচৈঃ পর্ব্বতের গুহাগুলি তত্রত্য উদ্দাম যৌবনশালী নাগরিক ও পণ্যস্ত্রীদের বিলাসক্ষেত্র। এ জাতীয়া নারীদের সম্বন্ধে ইহার অধিক আর বলিবারই বা কি আছে?

(৭) পুষ্পলাবী :

প্রাচীনকালে ফুলের যথেষ্ট সমাদর ছিল। ধনীনিধননির্ব্বিশেষে সকল নারীই ফুলের দ্বারাই প্রসাধন ও দেহসজ্জা করিতেন। ফুলের এ জন্য সার্ব্বজনীন চাহিদা থাকায়, ফুলসংগ্রহ ও বিক্রয় এক জাতীয় লোকের পেশা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। পুষ্পচয়নের নিমিত্ত পুরুষের প্রয়োজন হয় না, কাজেই অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল অবস্থার রমণীরাই জীবিকা হিসাবে এই কার্য্যটি বাছিয়া লইতেন। আমাদের প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও ফুল সরবরাহকারিণী বহু নারীর দর্শন মিলে। ভারতচন্দ্রেও পাই হীরা মালিনীকে। হীরা রাজবাড়ীতে ফুল যোগাইত, কিন্তু সংগ্রহ করিত কোথা হইতে, তাহা জানা যায় না। কিন্তু কালিদাসের কালে নীচৈঃ পর্ব্বতের প্রান্তবাহিনী বেত্রবতীর উভয় তীর পুষ্পোদ্যানে পরিপূর্ণ ছিল; নব মেঘের নবীন জলকণাসিক্ত হইয়া গুচ্ছে গুচ্ছে যূথিকা পুষ্প ফুটিয়া উঠিত এবং পুষ্পলাবীরা ইচ্ছামত সেই ফুল চয়ন করিত।

জ্যৈষ্ঠ শেষের কাঠফাটা রৌদ্র এ কালের মত সেকালেও ছিল, তাই সেই রৌদ্রের তেজে ও পরিশ্রমে পুষ্পসংগ্রাহিকাদের গণ্ডদেশ স্বেদাক্ত হইত এবং তাহাদের কর্ণালঙ্কাররূপে যে সব পদ্মফুল ব্যবহৃত হইত, সেগুলিও সেই প্রখর সূর্য্যতাপে শুকাইয়া যাইত। এ জন্য চলমান মেঘের ক্ষণিক ছায়াটুকুও তাহারা অত্যন্ত ভালবাসিত!

(৮) পৌরাঙ্গনা:

পৌরাঙ্গনা অর্থে কবি উজ্জয়িনী, দশপুর (বর্ত্তমান মান্দাসার) ও অলকার সাধারণ অধিবাসিনীদিগকেই বুঝাইয়াছেন। ইহাদের জীবনের অন্য কোনও সংবাদ কবি দেন নাই, দিয়াছেন কেবল বিলাসবহুলতা এবং বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত চকিত লোলাপাঙ্গের কাহিনী। উজ্জয়িনী বা বিশালার গ্রামবৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা "বৃহৎকথা"ন্তর্গত বৎসরাজ উদয়নের গল্প করিতেন। এখানকার প্রত্যুষে শিপ্রার শীকরবাহী মন্দ মধুর বাতাসে এবং সারসপংক্তির মদকলকূজনে রমণীদের রজনীর অবসাদ হরণ করিত। কুবলয়রেণুতে কৃতপ্রসাধনা যুবতীগণ গন্ধবতীর জলে জল-কেলি করিয়া নদীর জলকে পর্য্যন্ত পদ্মগন্ধী করিয়া তুলিতেন। চর্ম্মণ্বতীর অপর পারে দশপুর নগর। আকাশে আষাঢ়ের নবমেঘোদয় দেখিয়া, দশপুরবধূগণ পরিচিত দৃষ্টিভঙ্গীতে যখন তাঁহাদের কৃষ্ণসারের মত নিকষ কালো চোখ তুলিয়া মেঘের পানে চাহিতেন, তখন মনে হইত, তাঁহারা যেন কতকগুলি সদ্যঃ প্রস্ফুটিত কুন্দকুসুম আকাশে ছুঁড়িয়া দিয়াছেন, আর তাহারই পিছু পিছু এক ঝাঁক ভ্রমর ছুটিয়া চলিয়াছে।

(৯) ললিতবনিতা:

ইহারাও পৌরাঙ্গনা, তবে সাধারণ রমণী নহেন বলিয়াই মনে হয়। মাত্র দুইটি স্থানে ললিত-বনিতার উল্লেখ আছে, (১৩২ ও ২।১) আমার অনুমান, কবি ললিতবনিতা বলিতে ললিতকলার অনুরাগিনী বা ললিতকলার উপাসিকা নারীর কথাই বলিতে চাহিয়াছেন।

পুরনারীদিগকেই বুঝাইয়াছেন। ইঁহারা ধনী ও সম্ভ্রান্ত ঘরেরই ঘরণী, কারণ পূর্ব্বোক্ত দুইটি শ্লোকেই কবি ইঁহাদিগকে জালায়ন-সুশোভিত হর্ম্ম্য এবং মণিময় অভ্রংলিহাগ্র প্রাসাদের অধিবাসিনী বলিয়াছেন। ইঁহারা ললিতকলার অনুরক্ত বলিয়া ইঁহাদের ক্রিয়াকলাপও অনন্য-সাধারণ ও কলাময় ছিল। ধূপের ধোঁয়ায় ইঁহারা কেশ সংস্কার করিতেন, ভবনশিখীগণকে করতালি দিয়া নাচাইয়া শিখীর নৃত্য উপভোগ করিতেন এবং চিত্রাঙ্কন সঙ্গীতরচনা ও গীতবাদ্যে ইঁহারা সমান দক্ষ ছিলেন। প্রাসাদবাসিনী ললিতবনিতাদিগের গৃহগাত্রে অসংখ্য চিত্র শোভা পাইত এবং প্রাসাদগুলি সর্ব্বদাই সঙ্গীতে মুখরিত থাকিত। ইঁহাদের লাক্ষারাগাঙ্কিত চরণের রক্তচিহ্নে স্বচ্ছ মণিকুট্টিম দ্বিগুণ শোভান্বিত হইত।

যক্ষ তাহার পত্নীর কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিবার সময় বলিতেছে —"হয়ত তুমি গিয়া দেখিবে যে আমার স্ত্রী আমার বিরহকৃশ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতেছেন, আর নয় দেখিবে তিনি আমার নামসংযুক্ত তাঁহার স্বরচিত গানগুলি গাহিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছেন; প্রবল অশ্রুর বন্যায় তাঁহার উৎসঙ্গলীন বীণাটি বারংবার ভিজিয়া আর্দ্র হইয়া যাইতেছে।" যক্ষ নিজেও চিত্রাঙ্কন করিতে পারিতেন—

ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়াম্
আত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্ত্তুম্।
অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টি রালুপ্যতে মে
ক্রুরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ॥

দেখা যাইতেছে, যক্ষের স্ত্রীও ললিতবনিতা, যদিও তিনি অলকা নিবাসিনী। আর ললিতবনিতাদের সাক্ষাৎ পাই শ্রীবিশালা বিশালা নগরীতে। গুপ্ত যুগে, বিশেষতঃ সম্রাট বিক্রমাদিত্যের আমলে তাঁহার রাজধানী উজ্জয়িনীতে ললিতকলার অনুরাগিনী স্ত্রীরত্নের নিশ্চয়ই অভাব

ছিল না। তৎকালে এরূপ একটি রমণীসমাজ ছিল বলিয়াই, কবি তাঁহাদের সম্বন্ধে অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ এবং সসম্ভ্রম উক্তি করিয়াছেন।

(১০) বেশ্যা:

মেঘদূতের বেশ্যা পরবর্তী যুগে দেবদাসী নামে বিখ্যাত হইয়াছে। সন্ধ্যায় মহাকালমন্দিরে মহাকালের আরতির বাদ্যভাণ্ডের তালে তালে ইঁহাদিগকে পাদন্যাস করিতে দেখি; তাঁহাদের চরণভঙ্গীর তালে তালে মেখলাশিঞ্জন ধ্বনিও শ্রুতিগোচর হয়। কিছুদিন পূর্ব্বেও দক্ষিণ ভারতের শিবমন্দিরগুলিতে বহু দেবদাসী থাকিতেন, এখনও তাঁহারা একেবারে বিরল হন নাই।

বিবিধ রত্নখচিত দণ্ডশালী চামর ঢুলাইতে ঢুলাইতে তাঁহাদের হস্ত ক্লান্ত হইত। প্রথম আষাঢ়ের শীতল জলবিন্দুতে (চামরব্যজন ও নৃত্য জনিত) হস্তপদের জ্বালা ও ক্লান্তি নিবারণ করিয়া, ভ্রমরশ্রেণীর মত কালো চোখের সুদীর্ঘ কাল কটাক্ষ হানিয়া, সপুলকে তাঁহারা মেঘের পানে চাহিতেন।

(১১) অভিসারিকা:

প্রাচীন সংস্কৃত এবং বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যে অভিসার একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। গুপ্ত প্রেমাস্পদের সহিত মিলিত হইবার জন্য, গভীর রজনীর সূচিভেদ্য অন্ধকারে, সবার অজ্ঞাতসারে অভিসারিকারা কান্তের নয়নতৃপ্তিকর সাজে সুসজ্জিত হইয়া, সন্ত্রস্ত দেহে ও মনে এবং সতর্ক পদক্ষেপে সঙ্কেতস্থলের উদ্দেশ্যে অভিসারে বাহির হইয়া, রজনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই, নিজ নিজ নিকেতনে ফিরিয়া আসিতেন। পণ্য স্ত্রী বা বেশ্যারা যেরূপ দেহবিনিময়ে কাঞ্চনমূল্য গ্রহণ করে, অভিসারিকারা তাহা করিতেন না। ইঁহারা প্রেমাস্পদের

প্রীতিকামনাতেই এরূপ করিতেন। কাজেই অভিসারিকাদের মধ্যে মেঘদূতে ধনী ও মধ্যবিত্ত উভয় শ্রেণীর রমণীকেই আমরা পাই।

উজ্জয়িনীতে অভিসারিকারা সূচিভেদ্য অন্ধকারে বিদ্যুদালোকে পথ দেখিয়া সঙ্কেতস্থানে গমন করেন; অলকাতেও অভিসারিকারা রজনীর অন্ধকারে অভিসারে যান। এজন্য প্রত্যূষে অলকার রাজপথে অভিসারিকাদের দেহচ্যুত বহু পদার্থ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়, যেমন অলকানুবিদ্ধ মন্দারকুসুম, দেহের পত্রচ্ছেদ, কাণের কনককমল এবং স্তনপরিসরন্যস্ত মুক্তাজাল, গলার সূত্রহার (অর্থাৎ সূতার মত সরু হার, এখন যাহাকে আমরা সূতহার বলি) প্রভৃতি।

এই প্রসঙ্গে ইহা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, অভিসারিকাদের মধ্যে বিবাহিতা রমণীর সংখ্যাই বোধ হয়, ষোল আনা। বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া যাঁহারা স্বামী লাভ করিয়াছেন মাত্র, প্রেমাস্পদকে পান নাই, তাঁহারাই অন্তরের প্রণয়ক্ষুধা মিটাইবার জন্য আর এক জনকে কায়মনোবাক্যে ভালবাসেন, আর সেই একজনের জন্যই এই অভিসারযাত্রা। অনূঢ়াদের অভিসারযাত্রার কোনই প্রয়োজন হইত না, কারণ তখনও তাঁহারা প্রেমাস্পদলাভের বিষয়ে নিরাশ নহেন। কাজেই, অভিসারিকাদের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যে অনূঢ়াকে কোথাও পাওয়া যায় না। আমার অনুমান, বিবাহিত জীবনে হতাশ প্রেমিকারাই সেকালে অভিসারিকা হইতেন।

এইখানে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় এই যে, বর্ষাকালেই রমণীদিগকে আমরা অভিসারে বাহির হইতে দেখি, অন্য কোনও ঋতুতে নয়। ইহার কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তৎকালে তরুণগণ বৎসরের অন্য সব ঋতুতে বাণিজ্য শিক্ষা ভ্রমণ রাজাদেশ প্রভৃতি বিবিধ কার্য্য ব্যপদেশে প্রায়ই বিদেশে থাকিতেন, বর্ষার প্রারম্ভে গৃহে ফিরিতেন। কাজেই, প্রেমিকাগণও বর্ষাকালেই অভিসারিকা হইতেন।

(১২) খণ্ডিতা :

অভিসারিকাদের প্রেমাস্পদদের মধ্যে বিবাহিত প্রেমিকও থাকিত বলিয়া কবি খণ্ডিতাদিগকেও বাদ দেন নাই। অন্যত্র নিশাযাপনরত স্বামীদের পত্নীগণকে প্রত্যুষেও সারারাত্রি জাগরণক্লান্ত স্বামিবিরহ-কাতরা সাশ্রুনয়নারূপে দেখা যাইত। খণ্ডিতাদের সহিত সহানুভূতিশীল করিয়া কবি নলিনীগণকেও দাঁড় করাইয়াছেন। নলিনীবৃন্দের কমলবদন হইতে শিশিরাশ্রু মুছাইবার জন্য, ভানুও উক্ত স্বামীদিগের সহিত প্রভাতে আসিয়া প্রিয়ার নিকট দাঁড়ান এবং সাদরপ্রসারিত করে তাহাদের অশ্রু মুছাইয়া দেন।

(১৩) কিন্নরী :

কিন্নরীগণ হিমালয় পর্ব্বতে ত্রিপুরবিজয়ের গান গাহিয়া বেড়ান। ইহারাও দেবযানি বিশেষ। কিংপুরুষঃ তুরঙ্গবদনঃ ময়ূঃ (অমরকোষ)। কুবেরকে কিন্নরেশ বলা হয় (অমরকোষ)। অতএব কিন্নরীগণ যক্ষের স্বজাতি না হইলেও, প্রতিবেশিনী যে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(১৪) ত্রিদশবনিতা :

কৈলাসের ধবলতুষারপুঞ্জকে ইহারা দর্পণের ন্যায় ব্যবহার করেন। ক্রীড়াচ্ছলে এই সুরযুবতীরা মেঘের মধ্যে পল-তোলা বলয় শোভিত হাত দুইখানি ঢুকাইয়া দিয়া, মেঘকে সচ্ছিদ্রধারাযন্ত্রে পরিণত করেন।

(১৫) বারমুখ্যা :

কবি বারমুখ্যার বিশেষণস্বরূপ ত্রিদশবনিতা শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। অমরকোষকার বারমুখ্যার অর্থে বলেন—জনৈঃ সংকৃতা বেশ্যা—অর্থাৎ, জনগণের শ্রদ্ধেয়া বেশ্যা। পাছে আমরা অন্য কিছু বুঝি, কবি তাই ত্রিদশবনিতা বারমুখ্যা বলিয়া, স্বর্গের অপ্সরাগণকেই বুঝাইয়া-

ছেন। ইহারা অলকার বৈভ্রাজ নামক বহিরুপবনে যক্ষগণের সঙ্গিনী হইয়া, নানা রূপ আলাপ করিয়া বিচরণ করেন।

(১৬) অলকার নারী ঃ

অলকায় নারীরা সাধারণতঃ হস্তে লীলাকমল, অলকে কুন্দকোরক, আননে লোধ্ররেণু, চূড়াপাশে নবকুরুবক, কর্ণে শিরীষ এবং সীমন্তে কদম্ব ফুল ব্যবহার করেন। এখানে সিত মণিময় জ্যোতিশ্ছায়াকুসুমরচিত হর্ম্ম্যকুট্টিমে রমণীগণ প্রিয়তমের সহিত কল্পবৃক্ষপ্রসূত মধুপান করেন। প্রিয়গণ অনিভৃত করে প্রিয়তমার নীবীবন্ধন হঠাৎ শিথিল করিয়া দিলে, রমণীরা হ্রীবিমূঢ় হইয়া জ্বলন্মণিদীপের উপর মুঠি মুঠি চূর্ণ ফেলিয়া, দীপ নিভাইতে না পারিয়া বিফলমনোরথ হন। নারীরা এখানে চন্দ্রকান্ত মণিশোভিত চন্দ্রাতপের তলে প্রিয়তমের ভুজালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া সুখে নিদ্রা যান। অলকায় নারীদের অপাঙ্গবিভ্রম অমোঘ। রঙীন শাড়ী, নয়নে ভ্রূবিলাস কৌশল, যথাঅভিরুচি পুষ্পপল্লবের ভূষণ, চরণের লাক্ষা প্রভৃতি নারীর যাবতীয় বিলাস ও প্রসাধনের সামগ্রী, কল্পতরুবৃক্ষের নিকট যাচ্ঞা করিলেই পাওয়া যায়।

(১৭) কন্যা ঃ

সমগ্র মেঘদূতে মাত্র একটি শ্লোকে কন্যা বা অনূঢ়া বালিকার উল্লেখ করা হইয়াছে। অলকার এই কন্যাদের বর্ণনায় কবি সস্নেহে বলিতেছেন—মন্দাকিনীর সজল শীকরসম্পৃক্ত মৃদু বাতে, তন্তীরজাত মন্দারদ্রুমের সুশীতল ছায়ায়, স্বর্গঙ্গার কনকবালুসৈকতে, ইহারা মণি-গোপন খেলা খেলে। এই কন্যারা অমরগণেরও প্রার্থিত।

(১৮) কান্তা ঃ

যক্ষের পত্নী। পরম সৌভাগ্যবতী এই নারীরত্নের নিকটেই মেঘের দৌত্য। যক্ষপ্রিয়ার পরিচয়ে পাই, অলকাপতি কুবেরের গৃহের

অনতিদূরে প্রাসাদতুল্য যক্ষের বাড়ী। বাড়ীর এক কোণে একটি ছোট মন্দার তরু আছে, সেটি যক্ষপ্রিয়ারই স্বহস্তরোপিত। তিনি সেটিকে পুত্রের মত স্নেহ করেন। গৃহসংলগ্ন হ্রদতীরে স্বচ্ছ ইন্দ্রনীল মণি দ্বারা নির্ম্মিত একটি ক্রীড়াশৈল আছে, সেটি যক্ষগেহিনীর অতিশয় প্রিয়। প্রাঙ্গনে অশোক ও বকুল গাছ দুইটির মধ্যে সোণার একটা দণ্ড প্রোথিত আছে, তাহার মাথায় স্ফটিকের ফলকযুক্ত সুদৃশ্য একটি দাঁড় আছে। সন্ধ্যায় ময়ূরটি যখন গৃহে ফিরে, যক্ষপ্রিয়া তখন শ্রবণসুভগ বলয়শিঞ্জনের তালে তালে করতালি দিয়া তাহাকে নাচান।

যক্ষের কান্তা দেখিতে কেমন ?

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ॥

কান্তাও পতিবিরহে এখন বিরহিনী। বিরহিনীর বর্ণনা পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।

মেঘদূতের এই অষ্টাদশ প্রকার নারীর চিত্র আলোচনা করিতে করিতে কবির নিজস্ব পছন্দ অপছন্দেরও যেন কতকটা সন্ধান পাওয়া যায়। নারীর সৌন্দর্য্যে কবি দুইটি জিনিষকে খুব বেশী প্রাধান্য দিয়াছেন; একটি নারীর মেঘবরণ চুল, অন্যটি তাহার ভ্রূবিলাস। নারীর ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি চূর্ণালক এবং নিকষকালো বেণী কবি বহু উপমাতেও ব্যবহার করিয়াছেন। নারীর অপাঙ্গ অপেক্ষা অপাঙ্গের কটাক্ষই কবির নিকট সমধিক আদরণীয়। সকল কবিই নীল কালো ও স্থান বিশেষে লাল রঙ লইয়াই চোখের কথা বলেন, কিন্তু কালিদাস চোখের শাদা অংশ টুকুও

বাদ ত দেনই নাই, উপরন্তু এই উপেক্ষিত শ্বেতাংশটুকুকে লইয়া চোখের এমন একটি প্রকাশ দেখাইয়াছেন যাহা জগতের সাহিত্যে দুর্লভ। নারীর চরণকে কবি বরাবর পদ্মের সহিতই তুলনা করিয়াছেন এবং পদশোভা বর্দ্ধনের জন্য সর্ব্বদাই তাহাকে লাক্ষারাগে সুরঞ্জিত করিয়া দেখাইয়াছেন। কবির মতে, নারীর দেহসৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ প্রতীক যক্ষপ্রিয়া; কারণ তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।

কালিদাসের কালে রমণীর সৌন্দর্য্যের মাপকাঠিই হয়ত ঐরূপ ছিল। এজন্য কবির উমা শকুন্তলা প্রমুখ অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যেও যক্ষপ্রিয়ার রূপেরই প্রতিবিম্ব দেখি।

সেকালে নারীর রূপসজ্জা ও প্রসাধনে কমল কুন্দ কুরুবক কদম্ব শিরীষ যূথিকা মন্দার প্রভৃতি ফুল এবং লোধ্ররেণু অপরিহার্য্য এবং অপরিত্যজ্য ছিল। ধূপ চন্দন ও লাক্ষারসও প্রসাধনে প্রচুর ব্যবহৃত হইত।

কুসুমভূষণ ভিন্ন অন্যান্য অলঙ্কারও রমণীরা সেকালে পরিতেন: যেমন কেশে মুক্তাজাল, কটিতে শিঞ্জনমুখর মেখলা, প্রকোষ্ঠে কনকবলয়, হীরকবলয় এবং পলতোলা বলয় (বর্ত্তমান কঙ্কন), কণ্ঠে মুক্তাহার, সূত্রহার (সূতহার), মধ্যে ইন্দ্রনীল মণিশোভিত হার ইত্যাদি।

কালিদাসের কালে রমণীগণ যে ললিত কলারও বিশেষ চর্চ্চা করিতেন, মেঘদূতে তাহারও প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা বীণাবাদন, নৃত্য, সঙ্গীত, সঙ্গীতরচনা, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি কলাবিদ্যাতেও যথেষ্ট নিপুণা ছিলেন।

মেঘদূতে আমরা দেখি, সে কালের নারীরা, বিশেষতঃ তরুণীরা পরম সুখে প্রিয়তমের প্রিয়তমা হইয়া নিশ্চিন্ত ভাবেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

মেঘদূতে পাই না কেবল বৃদ্ধা, বিধবা, রুগ্ণা, দুঃখিনী ও দুঃস্থা নারীর চিত্র। আর পাই না কোনও শিশু বা সন্তানবতী নারীর পরিচয়। স্পষ্টই বোঝা যায় যে যক্ষ নিজে নিঃসন্তান ছিলেন, কাজেই কোথাও তিনি সন্তানবতী নারীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই। এত নারীচরিত্রের মধ্যে কোথাও মাতা কন্যা বা ভগিনীর কোন চিত্র নাই। দেবগিরি পর্ব্বতে কার্ত্তিকেয়জননী ভবানী পুত্রস্নেহে, পুত্রের বাহন বলিয়া ময়ূরকে আদর করিয়া, তাঁহার কুবলয়প্রাপি কর্ণে তুচ্ছ ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিতেন, প্রসঙ্গক্রমে কবি এইটুকুমাত্র বলিয়াই, মাতার পুত্রপ্রেমের কথা শেষ করিয়াছেন।*

২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫,

* ১৩ই মাঘ, ১৩৫১ চুঁচুড়া রবিবাসরের অধিবেশনে পঠিত

শ্রীমধুসূদন

আজ মধুসূদনের দ্বিসপ্ততিতম মৃত্যুতিথি। প্রতাপাদিত্য মধুসূদনের নাম-গর্ব্বিত পুণ্যভূমি এই যশোরের কবতক্ষ নদতীরের সাগরদাঁড়ী গ্রামে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে আজ ১২০ বৎসরের কথা। এ জন্য যশোহরবাসী গৌরব বোধ করেন, সত্যই এ গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা তাঁহাদেরই একান্ত নিজস্বও নহে। মধুসূদন বঙ্গদেশের গর্ব্ব, বঙ্গভারতীর গর্ব্ব এবং জাতিবর্ণধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বঙ্গবাসীর পরম গর্ব্বের ধন।

উত্তর কালে অসাধারণ মনীষা ও লোকোত্তর প্রতিভার সম্যক্ স্ফূরণে যিনি বাংলার ভাষা ও সাহিত্যে এক অভাবিত নব যুগ আনয়ন করিয়া-ছিলেন, বাংলা কাব্যের ইতিহাসে যাঁহার নাম অবিস্মরণীয় ও মৃত্যুঞ্জয়ী, আপনাতে আপনি যিনি চিরজীবিত অমর ও স্বতন্ত্র, যে কবির জীবন হইতে কালজয়ী কাব্য-মন্দাকিনী স্বতঃ উৎসারিত ও অভিন্ন, সেই পুণ্য শ্লোক মহাকবির স্মৃতিতর্পণে প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁহার জীবনকথার কিঞ্চিৎ আলোচনা শ্রদ্ধানিবেদনের উপকরণ হিসাবে অপরিহার্য্য। কারণ এ গুলি কবিপ্রতিভার বিকাশসাধনে যেমন সহায়তা করিয়াছে, কবিকে বুঝিতেও আমাদিগকে আজ তেমনি সাহায্য করিবে।

শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট মধুসূদনের বাংলা ও ফারসী শিক্ষারম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই সেখান হইতে তাঁহাকে সরাইয়া আনিয়া, কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষার জন্য হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি করাইয়া দেওয়া হয়। ১৮৩৪।৭ই মার্চ্চ তারিখে টাউন হলে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের পুরস্কারবিতরণী সভায় মধুসূদন শেক্সপীয়ারের হেনরি দি সিক্সথ নাটকের গ্লষ্টারের ভূমিকা আবৃত্তি করিয়া পুরস্কার

পান। তখন তাঁহার বয়স ৮ কি ৯, তিনি ৮ম জুনিয়ার শ্রেণীতে কেবল ভর্ত্তি হইয়াছেন।—সাহিত্য সাধক চরিত মালা ২৩, পৃ ৯।

হিন্দু কলেজে তাঁহার সহপাঠী ও বন্ধুবর্গের মধ্যে আমরা পাই ভূদেব চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গৌরদাস বসাক, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, জগদীশ নাথ রায়, রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, অবতারচন্দ্র গাঙ্গুলি (ও, সি, গাঙ্গুলী নামে পরে সুপরিচিত), বনমালী মিত্র, শ্যামাচরণ লাহা, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ তদানীন্তন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন জুনিয়ার পরীক্ষা দিয়া ৮৲ বৃত্তি পান।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন যখন ২য় সিনিয়ার শ্রেণীর ছাত্র, তখন "স্ত্রীশিক্ষা" বিষয়ে ইংরাজীতে লিখিত দুইটি শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধলেখককে রাম গোপাল ঘোষ মহাশয় দুইখানি পদক দিতে প্রতিশ্রুত হন। মধুসূদন এই প্রবন্ধপ্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া, স্বর্ণপদক পান এবং ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় হইয়া রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হন।

হিন্দু কলেজে পড়িবার সময়েই মধুসূদনের কবিত্ব শক্তির প্রকাশ পায়। মধুসূদন ইংরাজীতে কবিতা রচনা করিতেন এবং সেই সব রচনা তৎকালে জ্ঞানান্বেষণ, Literary Gazctte, Literary Gleaner প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। ক্রমশঃ মধুসূদন বিলাতী পত্র পত্রিকাতেও লেখা পাঠাইতে লাগিলেন এবং সেগুলি Bentleys Miscellany, Blackwoods Magazine প্রভৃতি পত্রে সাদরে প্রকাশিত হইত।

তাঁহার ইংরাজী কবিতার ঈদৃশ সমাদরে পঠদ্দশাতেই কিশোর মধুসূদনের মনে ইংরাজীতে মহাকবিরূপে খ্যাতিলাভ করিবার কল্পনা অঙ্কুরিত হয়। মনের এই অতিগোপন কথাটি তিনি তখন তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ গৌরদাস বসাককে লিখিয়াছিলেন : Oh! how should I like to see you write my 'Life', if I happen to be a

great poet, **which I am almost sure, I shall be**. if I can go to England.

বিত্যালয়ের ছাত্র কিশোর কবির এই উক্তিতে আমরা দেখি কবির অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, আত্মপ্রত্যয়শীল বলিষ্ঠ মনের দুর্নিরীক্ষ্যকে সমীক্ষণ এবং অবচেতন মনের ভবিষ্যৎ বাণী। কোনদিনই মধুসূদন এ আত্মবিশ্বাস হারান নাই। পরিণত বয়সেও তাই সদম্ভে তিনি লিখিতে পারিয়াছিলেন :

—উর তবে, উর দয়াময়ি
বিশ্বরমে, গাইব মা বীররসে ভাসি,
মহাগীত, উরি দাসে দেহ পদছায়া!
তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত ফুলবনমধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি!

—মেঘ, ২৬-৩২ ছত্র, ১ম সর্গ।

সেকালে যাহা দম্ভোক্তি বলিয়া উপহসিত হইয়াছিল, আজ ৮০ বৎসর পরে আমরা বুঝিতেছি, কবির ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য।

যাহাই হউক, মধুসূদনের আবাল্য একান্ত ও আন্তরিক কামনা ছিল —তিনি ইংরাজীতে কবিতা লিখিবেন, ইংরাজদের দেশে গিয়া বাস করিবেন এবং ইংরাজ মহাকবিগণের মধ্যে একজন পরিগণিত হইয়া জীবন সার্থক করিবেন, কৃতার্থ হইবেন। কাজেই, বাংলা ভাষা তাঁহার অস্পৃশ্য ছিল। সেকালের ইংরাজীশিক্ষিত বাঙালী তরুণদের মত মধুসূদনও মনে করিতেন, বাংলা ভাষা অশিক্ষিত ও বর্ব্বরের ভাষা, তাহা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল।

মধুসূদন হিন্দুকলেজে ২য় সিনিয়ার শ্রেণীতে পড়েন, ইংরাজীতে কবিতা লেখেন, বিলাতী সাময়িক পত্রাদিতে সেগুলি ছাপা হয়, আর তিনি বিলাতের স্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকেন। বিলাত যাওয়ার ইচ্ছা যে তাঁহার কিরূপ প্রবল ছিল, তাহা গৌরদাসকে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ হইতে বুঝা যায়:

······you know my desire for leaving this country is too firmly rooted to be removed. The sun may forget to rise, but I cannot remove it from my heart. Depend upon it, in the course of a year or two more, I must either be in E—d or cease 'to be' at all; **One of these must be done.**

ইংরাজী কবিতা লিখিয়া মধুসূদন ইহারই মধ্যে বেশ যশস্বী হইয়াছিলেন, কিন্তু বাংলায় একটি ছত্রও কিছু লিখিলেন না। গৌরদাস প্রায়ই অনুযোগ করেন, মধুর মন হইতে বাংলা ভাষার উপর এই বিজাতীয়সুলভ বিদ্বেষ দূর করাইতে কত উপদেশ দেন, কিন্তু মধু তাহাতে কর্ণপাতও করেন না! তাঁহার সেই একই কথা—এ ভাষা অশিক্ষিতের ও বর্ব্বরের ভাষা। তবু পরম সুহৃৎ গৌরদাসের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, তিনি একদিন ইংরাজী acrostic কবিতার অনুকরণে ৮ ছত্রের একটি বাংলা কবিতা লিখিয়া গৌরদাসকে উপহার দেন। এইটিই মধুর প্রথম বাংলা কবিতা। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি:

বর্ষাকাল।

গভীর গর্জ্জন সদা করে জলধর
উথলিল নদনদী ধরণী উপর।
রমণী রমণ লয়ে সদা কেলি করে
দানবাদি দেব, যক্ষ সুখিত অন্তরে।

সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব
বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব।
স্বাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়
কলহ করয়ে কোন মতে শান্ত নয়।

—যোগীন্দ্রনাথ বসুর মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত (৪র্থ সং) পৃঃ ১০১-১০২।

এই কবিতাটির প্রথম অক্ষরগুলি একত্র করিয়া পড়িলে হইবে, গউরদাস বসাক।

এ হেন কালে অর্থাৎ ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন যখন সত্যসত্যই কায়ে মনে এবং বাক্যে বিলাতের ধ্যানে তন্ময়, মধুসূদনের পিতা তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ করেন। মধুসূদন এ সংবাদে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানবিবর্জ্জিত হইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন, কিসে এ বিবাহ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। যে মধু বাংলা ভাষা বাংলা দেশ বাংলার সংস্কৃতি কিছুই পছন্দ করে না, বরং ঘৃণা করে, তাহার কি না হইবে এক বাঙালী স্ত্রী? মধুর এ কল্পনাও অসহ্য বোধ হইল। অথচ পিতার আদেশ। মধুসূদন অগ্র পশ্চাৎ কোন চিন্তা না করিয়া, এই বিবাহের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া, হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হইয়া পড়িলেন। কিছুদিন পরে জানা গেল, মধুসূদন ১৮৪৩, ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত নামে প্রচারিত হইতেছেন।

ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া মধুসূদন তিন বৎসর বিশপ্ কলেজে অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তিনি গ্রীক ল্যাটিন সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন।

বিশপ কলেজ হইতে মধুসূদন Madras Male Orphan Asylum এ ইংরাজী শিক্ষকের এক চাকরী লইয়া হঠাৎ একদিন

মাদ্রাজ চলিয়া যান এবং সেখানে উক্ত বিদ্যালয়ের সংলগ্ন বালিকা-বিভাগের ছাত্রী, রেবেকা ম্যাক্টাভিচ নাম্নী এক ইংরাজ নীলকরের কন্যাকে বিবাহ করেন।

মাদ্রাজে অবস্থান কালে মধুসূদন Spectator, Athenaeum প্রভৃতি পত্রের সম্পাদকরূপেও কিছুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন।

এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন Captive ladie ও Visions of the past একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এই Captive ladie-ই মধুসূদনের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ :

মধুসূদনের বয়স এখন ২৪ বৎসর। ইহারই মধ্যে মধুসূদন ইংরাজের ধর্ম্ম, ভাষা, পরিচ্ছদ এবং ইংরাজ স্ত্রী পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া, পরিপূর্ণভাবে এক "ট্যাঁশ ফিরিঙ্গি" হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি নিজেও জানিতেন, তিনি বেশ চলনসই এক "ট্যাশ ফিরিঙ্গি" বনিয়া গিয়াছেন! মাদ্রাজ হইতে ১৮৪৯।১৯শে মার্চ্চ তারিখে গৌরদাস বাবুকে লিখিত পত্রে মধুসূদন লিখিয়াছিলেন :

...All my pupils are European and East-Indians, I dress like them, both on account of my good lady and the situation I hold. Did you ever see me in my European clothes? I make a passable "Tash Feringee."

যে-মধুসূদন আজ বাংলার ও বাঙালীর গৌরব, যে-মধুসূদন বঙ্গ ভাষার একমাত্র জাতীয়মহাকবি, সে মধুসূদনকে আমরা প্রায় হারাইয়াই ফেলিয়াছিলাম! যদি এ সময়ে তাঁহার Captive ladie গ্রন্থ প্রকাশিত না হইত, তাহা হইলে বঙ্গগৌরব "বঙ্গের পঙ্কজ রবি শ্রীমধুসূদন" আজ বিপুল ও বিরাট ট্যাশফিরিঙ্গি-মহাসমুদ্রের কোন অতলে অবলুপ্ত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেন!

গৌরদাসবাবুর অনুরোধে এবং তাঁহারই মারফতে মধুসূদন এই গ্রন্থের এক খণ্ড কলিকাতার তৎকালীন কাউন্সিল অফ্ এডুকেশনের সভাপতি স্বনামধন্য ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনকে উপহার প্রেরণ করেন। বীটন সাহেব এই কাব্যগ্রন্থ উপহার পাইয়া গৌরদাসকে ১৮৪৯।২০শে জুলাই যে দীর্ঘ পত্র লিখেন, তাহা এই :

I beg that you will convey my thanks to your friend for the gift of his poem. It seems an ungracious return for his offering that I should take this opportunity through you, of endeavouring to impress on him the same advice which I have already given to several of his countrymen, which is, that he might employ his time to better advantage than in writing English poetry. As an occasional exercise and proof of his proficiency in the language, such specimens may be allowed. But he could render far greater service to his country and have a better chance of achieving a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents, which he has cultivated by the study of English, improving the standard and adding to the stock of the poems of his own language, if poetry at all events he must write.

By all that I can learn of your Vernacular literature, its best specimens are defiled by grossness and indecency. An ambitious young poet could not desire a finer field for exertion than in taking the lead

in giving his countrymen in their own language a taste for something higher and better. He may even do good service by translation. This is the way by which the literature of most European nations has been formed.

গৌরদাস এই পত্রখানি মধুসূদনকে পাঠাইয়া দিয়া নিজে লিখিয়াছিলেন :

......His advice is the best you can adopt. It is an advice that I have always given you and will din into your ears all my life. The taste and talents you have cultivated would rebound much to the honor and advantage of your country, if you will employ them in improving the standard and adding to the stock of your own language, if poetry at all events you must write. We do not want another Byron or another Shelley in English ; what we lack is a Byron or a Shelley in Bengalee literature.

এই দুইখানি পত্রে, বিশেষতঃ বীটন সাহেবের পত্রে, সূর্য্যোদয়ে তমসার মত মধুসূদনের মনের মোহজড়িমা ঘুচিয়া গেল। আত্মবিস্মৃত কবির মোহনিদ্রা টুটিয়া গিয়া নব জাগরণ ঘটিল। কবিমনের কুজ্ঝটিকা কাটিয়া গিয়া নব প্রভাতের অরুণোদয় হইল। বঙ্গবাণী তাঁহার হারান সন্তানকে ফিরিয়া পাইলেন। ক্যাপটিভলেডী গ্রন্থ ও বীটনসাহেবের পত্রের ফল স্বরূপ আমরা পাইলাম, আমাদের জাতীয় মহাকবি শ্রীমধুসূদনকে।

বীটন্ সাহেবের পত্রপ্রাপ্তির পর প্রায় এক মাসের মধ্যেই মধুসূদন বঙ্গবাণীর সংস্কার ও উন্নয়নে কৃতসংকল্প হইয়া বিভিন্ন ভাষা

শিক্ষায় মনোযোগী হইয়া পড়িলেন। ১৮৪৯।১৮ই আগষ্ট তারিখে তিনি গৌরদাসকে লিখিলেন—

Perhaps you do not know that I devote several hours daily in Tamil. My life is more busy than that of a school-boy. Here is my rontine : 6 to 8 Hebrew ; 8 to 12 School ; 12-2 Greek, 2-5 Telegu and Sanskrit, 5-7 Latin, 7-10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers ?

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে, রেবেকার সহিত বিবাহ বন্ধনও এই সময় ছিন্ন হয় এবং এমিলিয়া হেন্‌রিয়েটা সোফিয়া নাম্নী এক ফরাসী যুবতীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিবাহও হয়। শুনা যায়, এই যুবতীর পিতা মাদ্রাজ মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা বা অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। —নগেন্দ্রনাথ সোমের "মধুস্মৃতি", পৃ ৯১-৯২

১৮৫৬।২রা ফেব্রুয়ারী মধুসূদন মাদ্রাজ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং কলিকাতা পুলিশকোর্টে এক কেরাণীর পদ গ্রহণ করেন। এই কার্য্যকালেই তিনি আইন পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

পুলিশকোর্টে কার্য্য করিবার সময়, মধুসূদন কিছুদিন কিশোরীচাঁদ মিত্রের দমদমাস্থ বাগানবাড়ীতে ছিলেন। এখানে তৎকালে সাহিত্যিক-গণ প্রায়ই সম্মিলিত হইতেন। এই খানেই "আলালের ঘরের দুলাল" প্রণেতা প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়।

মধুসূদন আলালী ভাষা মোটেই পছন্দ করিতেন না। একদিন তিনি টেকচাঁদকে বলেন—আপনি দেখিতেছি পোষাকের পাট তুলিয়া

দিয়া ঘরে বাহিরে সভাসমাজে সর্ব্বত্রই এই আটপৌরে চালাইতে চাহেন। ইহাও কি সম্ভব?—সাহিত্য সাধক চরিত মালা (২৩) পৃ ৩১-৩২

প্যারীচাঁদ উত্তেজিতভাবে কহিলেন—তুমি বাঙ্গালা ভাষার কি বুঝিবে? তবে জানিয়া রাখ, আমার প্রবর্ত্তিত এই রচনাপদ্ধতিই বাঙ্গালা ভাষায় নির্ব্বিবাদে প্রচলিত এবং চিরস্থায়ী হইবে।

মধুসূদন তাঁহার স্বভাবসুলভ হাস্য সহকারে তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—It is the language of Fishermen, unless you import largely from Sanskrit. উহা আবার একটা ভাষা নাকি? দেখিবেন, আমি যে ভাষার সৃষ্টি করিব তাহাই চিরস্থায়ী হইবে।

* * * সমবেত সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।—মধুস্মৃতি, পৃ ৯৭-৯৮।

চিরস্থায়ী কিছু একটা করিবার, কবিহিসাবে অমর হইবার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অভিনব এক শক্তি সঞ্চার করিবার দুর্দ্দমনীয় একটা কামনা যে মধুসূদনের মনকে সে সময় সর্ব্বক্ষণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত, তাহা তাঁহার বহু কথাবার্ত্তা ও আলাপ আলোচনায় আপনা আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়িত। এজন্য মধুসূদন হাস্যাস্পদও কম হইতেন না, কিন্তু তাঁহার অন্তরদেবতা তাঁহাকে সেজন্য কথনও দমিতে দিতেন না। মধুসূদন নিজেই জানিতেন না যে তিনি কি করিতে পারেন; কিন্তু তিনি যে মহত্তম বৃহত্তম অবিস্মরণীয় একটা কিছু করিবেনই, ইহা ছিল তাঁহার অন্তর্বোধি, অতীন্দ্রিয় প্রতীতি।

অনির্দ্দেশ্য অনির্দ্দিষ্ট এই আকাঙ্ক্ষা মধুসূদনের মনে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলিয়া তাঁহার অন্তরের ক্ষীরোদসাগরকে যখন সংক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, সেই সময়ে বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্য পাইকপাড়ার রাজভ্রাতাদ্বয় প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অনুরোধে, ইংরাজদর্শকদিগের জন্য মধুসূদন "রত্নাবলী" নাটকের এক ইংরাজী অনুবাদ করিয়া দেন। মধুর

ইংরাজী অনুবাদ দেখিয়া তৎকালীন ছোটলাট স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে প্রমুখ বিশিষ্ট ইংরাজগণ চমৎকৃত হইয়া অনুবাদকের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

রত্নাবলীর মহলা দেখিতে দেখিতে মধুসূদনের মনে বাংলায় নাটক লিখিবার ইচ্ছা হয় এবং অচিরে তিনি "শর্ম্মিষ্ঠা" নাটক রচনা করিয়া ফেলিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ "শর্ম্মিষ্ঠা"র পাণ্ডুলিপি পড়িয়া আশাতীতরূপে প্রীত হইলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি শর্ম্মিষ্ঠা প্রকাশিত হইল এবং ৩রা সেপ্টেম্বর উক্ত নাট্যশালা কর্তৃক উহা অভিনীত হয়। মধুসূদন শর্ম্মিষ্ঠার ইংরাজীতে অনুবাদও করিয়াছিলেন।

সেকালে নাটকের সঙ্গে একটা প্রহসন অভিনয়ের রীতি ছিল। কাজেই শর্ম্মিষ্ঠার সঙ্গে অভিনীত হইবার জন্য মধুসূদন একে একে "একেই কি বলে সভ্যতা" ও "বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ" নামক দুই খানা প্রহসনও রচনা করিয়া ফেলিলেন। প্রথম প্রহসনখানি বিশেষ কারণে অভিনীত হইতে পারে নাই।—সাহিত্য সাধক (২৩) পৃ ৪

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে "পদ্মাবতী" রচিত ও প্রকাশিত হয়। পদ্মাবতীতেই মধুসূদন সর্ব্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন:

কঞ্চুকী। আহা, শৈলেন্দ্রের গলে শোভে যে রতন
সে অমূল্য ধন কভু সহজে কি তিনি
প্রদান করেন পরে? গজরাজ শিরে
ফলে যে মুকুতারাজি, কে লভয়ে কবে
সে মুকুতারাজি, যদি না বিদরে আগে
সে শিরঃ? সকলে জানে, সুরাসুর মিলি
মথিয়া কত যতনে সাগর, লভিলা
অমৃত—কত পীড়নে পীড়ি জলনিধি।

হায়রে কে পারে পরে দিতে ইচ্ছা করি
যে মণিতে গৃহ তার উজ্জ্বল সতত ?

এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম জন্ম। ইহাতেও মেঘনাদবধের রচনারীতি, ব্যঞ্জনা ও পূর্ব্বাভাষ কি লক্ষ্য করা যাইতেছে না? বাল্মীকির রসনায় প্রথম শ্লোকোদয়ের মত এক পরম শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে মধুসূদন এই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করিয়া ফেলিলেন।

পদ্মাবতীর পর মধুসূদনের দ্বিতীয় নাটক কৃষ্ণকুমারী।

বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন যে মধুসূদনের অদ্বিতীয় অপরাজেয় ও অবিনশ্বর কীর্ত্তি, তাহার মূলে আছে একটি সুমধুর ঘটনা।

১৮৫৯।১লা ডিসেম্বর তারিখে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর একখানি পত্রে গৌরদাসকে একটা ভারি মজার ঘটনার কথা লিখিয়াছিলেন :

......It was a fine evening when we were sitting in the lower hall of the Belgatchia Villa where the stage had been set up for the performance of "Ratnabali", ... It was a rehearsal night. ... ... the conversation gradually turned upon the subject of Drama in general and of Bengalee Drama in particular. Michael said "no real improvement in the Bengalee Drama could be expected until blank verse was introduced into it." I replied that "it did not seem to me possible to introduce this kind of verse into our language, for I held that the very nature and construction of the Bengalee language was ill-adapted for the stately measure and sonorous cadence of blank verse."

"I do not agree with you" said he "and I think it is well worth making an attempt." "You remember" I added "how once the late Ishwar Chandra Gupta made a caricature of blank verse in Bengalee, beginning with the lines

কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি
ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই।" "Oh" said he "it is no reason because old Ishwar Gupta could not manage to write blank verse that nobody else will be able to do it." "But" I said "if I am correctly informed the French which is no doubt more copious and elaborate language than our own, has not in it any poem in blank verse. No wonder then that the Bengalee should be found unsuited to this kind of versification," "You forget, my dear fellow," he replied "that the *B*engali is born of Sanskrit than which a more copious and elaborate language does not exist." "True " said I "but as yet the Bengali seems to be a weakling though born of a healthy and robust mother." "Write me down an ass" said he laughingly "if I am not able to convince you of your error within a short time." Then looking sharply at me he added "and what, if I succeed in proving to you that the Bengalee is quite capable of the blank verse form of poetry." ... ... and as a matter of

fact within three or four days the first canto of তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য was sent to me. ... ...

একদিন যে মধুসূদন বাংলা ভাষাকে বর্ব্বর ও অশিক্ষিতের ভাষা এবং যে ভাষা ভুলিয়া যাওয়াই উচিত বলিয়া সদম্ভে অবজ্ঞা করিতেন, সেই মধুসূদন আজ তেমনি গর্ব্বভরেই বলিতেছেন—the Bengali is quite capable of the blank verse form of poetry. Write me down an ass if I am not able to convince you of your error withi n a short time.

জগতের সাহিত্যে এত বড় প্রতিভা আর কোথাও জন্মিয়াছে কিনা জানি না।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশিত হয়। বাংলায় এই সর্ব্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের কাব্যখানি মহারাজা যতীন্দ্রমোহনকে উৎসর্গ করিয়া কবি লিখিয়াছিলেন—

> যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য; কেননা এরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিগণিত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্ব্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্‌দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো সে শুভকালে এ কাব্যরচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক যে কি ধিক্কার কি ধন্যবাদ কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।

আজ তিনি সত্যই মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন, তাই বলিয়া আমাদের এই গভীর শ্রদ্ধানিবেদন যে তাঁহার শ্রীচরণে পৌঁছিতেছে না, একথা আমি বিশ্বাস করি না। তিনি যে অমর, তিনি আমাদের অন্তরে।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দুইখণ্ডে মেঘনাদবধ মহাকাব্য প্রকাশিত হয়। মেঘনাদ বধের প্রথম খণ্ড বাহির হওয়া মাত্রই মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের গৃহে তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভায় বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তনের জন্য মধুসূদনকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হয়।

ইঁহাদের প্রদত্ত মানপত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে মধুসূদনের কবিখ্যাতি ও জনপ্রিয়তা মেঘনাদবধ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কিরূপ সমুন্নত হইয়া উঠিয়াছিল।

* * * আপনি বাঙ্গালা ভাষায় যে অনুত্তম অশ্রুতপূর্ব্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমরা পূর্ব্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে কালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। আপনি বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন ইত্যাদি।—সা, সা, গ্র (২৩) পৃ ৫১-৫২।

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ও তাঁহার "হুতোম প্যাঁচার নক্শা"য় মধুসূদনের অনুসরণে দুইটি অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর "ব্রজাঙ্গনা" কাব্য, বৈষ্ণবপদাবলীর অনুসরণে কেবল বিরহ বর্ণনাতেই সম্পূর্ণ। ব্রজাঙ্গনাই বাংলায় সর্ব্বপ্রথম লিরিক বা গীতিকাব্য। ব্রজাঙ্গনায় কবি বিবিধ প্রকারের সুললিত ছন্দ সৃষ্টি করিয়া দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন যে তিনি শুধু অমিত্রাক্ষর ছন্দেরই কবি নহেন, মিত্রাক্ষরেও তাঁহার প্রতিভা মধ্যাহ্নভাস্করের মতই ভাস্বর। জয়দেবের হাতে সংস্কৃত ভাষার ললিত কোমল কান্ত পদাবলীতে যে রস রূপায়িত হইয়াছিল, গোবিন্দদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণের মানসবৃন্দাবনে ব্রজবুলিতে যে রসসমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, মধুর মধুচক্রে খাঁটি বাংলা ভাষায় সেই অমৃত রসধারা আধুনিক গৌড়জনকে এই প্রথম অভিসিঞ্চিত করিল।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে রোম্যান কবি ওভিদের Heroic Epistles এর অনুকরণে কবি "বীরাঙ্গনা কাব্য" রচনা করেন। পত্রচ্ছলে কাব্যরচনাও বাংলায় অভিনব প্রবর্ত্তনা।

মধুসূদন জীবনে কোনদিন চলা পথে চলেন নাই, অচল পথেই তাঁহার জীবনের যাত্রা শুরু হইয়াছিল। ঝঞ্ঝায় বরষায় তমসায় তিনি একলা যাত্রী। সাহিত্যেও তাই তিনি অচল পথেরই সন্ধান করিয়া লইয়াছিলেন এবং নিত্য নব-নব অনাবিস্কৃত পথ আবিস্কার করিয়া তাহার দুই পাশে অজস্র ফুলবন রচনা করিয়া গিয়াছেন।

স্বদেশবাসীর নিকট সম্মান লাভ করিয়া এবং তাঁহার চিরআকাঙ্ক্ষিত আবাল্যপোষিত মহাকবিসমুচিত যশের উচ্চশিখরে আরূঢ় হইয়া মধুসূদন লিখিলেন—

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে।

বাস্তবিক, এতকাল যে বৃথা নষ্ট করিয়াছেন, এতদিনে তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়া, অনুতপ্ত হইলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে মধুসূদন এ সময়ে চাকরী করিতেন। দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের "নীলদর্পণ" নাটক এই সময়ে এক অভাবিত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ইয়ুরোপীয় সমাজ এই নাটকের বিষয়বস্তু অবগত হইবার জন্য রেভারেণ্ড লং-কে নাটকখানি ইংরাজীতে অনুবাদ করাইতে বলেন। লং সাহেব নীলদর্পণ অনুবাদ করিবার জন্য মধুসূদনকে ধরেন, মধুসূদন তাহা করিয়া দেন। লংসাহেবের ভূমিকায় আছে—

The original Bengali of this Drama—the Nil Darpan or Indigo Planting Mirror—having excited considerable interest, a wish was expressed by various Europeans to see a translation of it. This has been

made by a Native, both the original and translation are bona fide Native productions and depict the Indian Planting system as viewed by Natives at large.

এ Native আর কেহই নহেন—মধুসূদন দত্ত। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :

......ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি শেষে তাঁহার জীবন নির্ব্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকুরী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।—বিবিধ।—সা, সা, চ, মা, (২৩)—পৃ ৫৯।

১৮৬২।৯ই জুন তারিখে পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি বিক্রয়াদি করিয়া মধুসূদন "ক্যাণ্ডিয়া" নামক জাহাজে ইয়ুরোপ যাত্রা করিলেন। এতদিনে মধুর বিলাত যাওয়ার ইচ্ছা ফলবতী হইল। যাত্রার অনতিপূর্ব্বে কবি রাজনারায়ণ বসুকে একখানি পত্র লিখেন এবং তন্মধ্যে "বঙ্গভূমির প্রতি" কবিতাটি প্রেরণ করেন।

একদিনের "ট্যাঁশ ফিরিঙ্গি" আজ বঙ্গভূমির জাতীয় কবি। স্বদেশ ত্যাগ করিবার সময় দেশমাতৃকার বরপুত্র, অশ্রুভারাবনত অন্তরে বলিয়াছিলেন—

রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে
সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।

* * *

সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজন ;
কিন্তু কোন্ গুণ আছে যাচিব যে তব কাছে
হেন অমরতা আমি কহ গো শ্যামা জন্মদে।

তবে যদি দয়া কর ভুল দোষ গুণ ধর
অমর করিয়া বর দেহ দাসে সুবরদে।
ফুটি যেন স্মৃতি জলে মানসে মা যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত কি শরদে।

মধুসূদন কায়মনোবাক্যে অমরত্ব কামনা করিতেন, দেবতা তাহা শুনিয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে "অমর করিয়া বর" দানই করিয়াছেন।

প্রবাসে অবস্থানকালে মধুসূদন অর্থকষ্টে বড়ই দুঃখ পাইতেন, কিন্তু বঙ্গভাষার সেবায় তিনি তজ্জন্য এতটুকু কখনও অবহেলা করেন নাই।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভার্শাইয়ে বাসকালে মধুসূদন বাংলায় সনেট বা চতুর্দ্দশপদী কবিতারীতি প্রবর্তনে মনোযোগী হন এবং প্রায় শতাধিক সনেট রচনা করিয়া ফেলেন। ভার্শাই হইতে ১৮৬৫।২৬শে জানুয়ারী তারিখে মধুসূদন গৌরদাসকে যে দীর্ঘ পত্র লিখেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। মধু তখন ইতালিয়ান, জার্ম্মান ও ফ্রেঞ্চ ভাষা শিখিতেছিলেন।

.. ...Should I live to return, I hope to familiarise my educated friends with these languages through the medium of our own. After all, there is nothing like cultivating and enriching our own tongue. ... ...I pray God, that the noble ambition of Milton to do something for his mother-tongue and his native land may animate all men of talent among us. If there be anyone among us anxious to leave a name behind him, and not pass away into oblivion like a brute, let him devote himself to his mother-tongue, that is his legitimate sphere, his proper element........when

we speak to the world, let us speak in our own language. Let those who feel that they have springs of fresh thought in them, fly to their mother-tongue..........I have been lately reading Petrarca, the Italian Poet and scribbling some "Sonnets" after his manner......I dare say the sonnet চতুর্দ্দশ পদী will do wonderfully well in our language. I hope to come out with a small volume, one of these days. Write to me what you all think of this new style of Poetry, Believe me, my dear fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up. Such of us, owing to early defective education, know little of it and have learnt to despise it, are miserably wrong. It is, or rather it has the elements of a great language in it.......

এই পত্রখানিতে সনেট রচনার কথা অপেক্ষা মধুর বাংলা ভাষার প্রতি অন্তরের টানটিই বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। মধুসূদনের সনেট রচনা অবশ্য এই প্রথম নয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—

......I want to introduce Sonnet into our language and some morning ago I made the following.........এই পত্রের মধ্যে কবি একটি সনেট পাঠাইয়াছিলেন, তাহার নাম, কবি—মাতৃভাষা।

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য; তা সবে আমি অবহেলা করি

অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন শয়ন ত্যজে ইষ্টদেবে স্মরি
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায়মন।
বঙ্গকুললক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধনপতি ?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দসদনে ?

বাংলা ভাষায় এইটিই প্রথম সনেট।

১৮৬৬।১৭ই নভেম্বর মধুসূদন গ্রেজ ইন্ হইতে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৬৭ ফেব্রুয়ারী মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে মধুসূদন ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিলেন কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যেই ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া ১৮৭০ জুন মাসে তিনি হাইকোর্টেই এক চাকুরি গ্রহণ করেন। এ পদের বেতন তখনকার দিনে হাজার হইতে দেড় হাজার টাকা ছিল, কিন্তু এ টাকাতে মধুসূদনের কুলাইত না বলিয়া, এ চাকুরি ছাড়িয়া পুনরায় তিনি ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিলেন।

ইয়ুরোপ হইতে ফিরিয়া মধুসূদন সাহিত্যসেবা অপেক্ষা অর্থোপার্জ্জনের দিকেই বেশী মনোযোগী হইয়া পড়িলেন, কারণ তিনি ছিলেন অত্যন্ত বেহিসাবী।

আবার ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি পঞ্চকোট রাজ্যে

এক চাকুরী লইলেন, কিন্তু এ চাকুরিও অতি অল্প দিনের মধ্যেই পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটার স্থাপিত হয় এবং মধুস্দনের পরামর্শে অভিনেত্রী সহ অভিনয় করা স্থির হয়। স্ত্রীভূমিকায় স্ত্রীলোক লইয়া শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয় হইল। সাধারণ নাট্যশালায় এই প্রথম অভিনেত্রীর অবতরণ।

মধুস্দনের স্বাস্থ্য কিন্তু এ সময়ে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। রোগশয্যায় শুইয়া শুইয়াই তিনি বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য "মায়াকানন" রচনা করেন এবং "বিষ না ধনুর্গুণ" নামে আরও একখানি নাটকে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, শেষোক্তখানি আর তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

মায়াকানন বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য লিখিত কিন্তু অভিনীত হইয়াছিল ১৮৭৪।১৮ই এপ্রিল তারিখে। তাহার বহু পূর্ব্বে "সম্বরি সংসার লীলা আপনার শ্রীমধুস্দন" তাঁহার সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

১৮৭৩।জুন মাসে মধুস্দন তাঁহার পত্নী হেনরিয়েটা ও পুত্র কন্যাসহ বেনিয়াপুকুরে একটা বাসায় থাকিতেন। একদিকে কবি মুমূর্ষু অন্যদিকে পত্নীও মৃত্যুশয্যায়। যে অর্থকষ্ট তাঁহার চিরজীবনের সাথী, ছিল, সেটা এক্ষণে চরমে উঠিয়াছিল। কাজেই সুচিকিৎসার জন্য মধুস্দনের বন্ধুগণ (ব্যরিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ, মেডিক্যাল কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক ডাঃ সূর্য্যকুমার গুডীভ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি) তাঁহাকে জেনারেল হাঁসপাতালে লইয়া গিয়া তৎ-কালের শ্রেষ্ট চিকিৎসকদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এদিকে বেনিয়াপুকুরে হেনরিয়েটার চিকিৎসারও ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু কোনও ফল ফলিল না। ১৮৭৩।২৬শে জুন বৃহস্পতিবার অর্থাৎ

স্বামীর মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে সতী সাধ্বী এই মহীয়সী নারী মহাপ্রস্থান করিলেন।

ইহার তৃতীয় দিনে, ১৮৭৩।২৯শে জুন রবিবার বেলা ২টায় বাংলার অমর কবি শ্রীমধুসূদন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙালীকে কাঁদাইয়া মহাপ্রয়াণ করিলেন। কবি লিখিয়াছেন, "লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেলা অস্তাচলে," আমরা বলিতেছি

বঙ্গের পঙ্কজ রবি গেলা অস্তাচলে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে অর্থাৎ মধুসূদনের আবির্ভাব সময়ে ভারতচন্দ্রের আদর্শ ও ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব বাংলা সাহিত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। একদিকে ভারতচন্দ্রের পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে ও তৎপ্রদর্শিত ও তৎপ্রবর্ত্তিত সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী যমক উৎপ্রেক্ষা ব্যাজস্তুতি প্রভৃতির প্রচলনই বাংলা কাব্য রচনায় উৎকর্ষের নিদর্শন ছিল। অবশ্য ভারতচন্দ্রের ন্যায় শক্তিমান কবির হাতে যাহা ভাষাজননীর অঙ্গে অলঙ্কাররূপে বিরাজ করিয়াছিল, অন্যের অক্ষম হস্তে ভারতীর দেহে সে গুলি হইয়া পড়িয়াছিল কলঙ্কের ভার ও শৃঙ্খল। কাজেই বাংলা সাহিত্য দিন দিন অবনতই হইয়া পড়িতেছিল।

অন্য দিকে ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয় আনিয়া দিলেন চুট্‌কী চটুলতা, ব্যঙ্গরঙ্গ এবং হাস্য পরিহাস। বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ এ দুইয়ের কোনটিতেই আশানুরূপ হইতেছিল না। বাংলা গদ্যও ঠিক পূর্ব্বোক্ত দুই রীতির টানে হইয়া পড়িয়াছিল পঙ্কিল।

ইহার উপর পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিজয়বৈজয়ন্তী আনিল ইংরাজী শিক্ষা এবং ইংরাজী সাহিত্য। কাজেই তদানীন্তন তরুণদল ইংরাজী সভ্যতা ও সাহিত্যের মোহে অভিভূত হইয়া পড়িল। জাতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি এই মোহের তীব্র আলোকে শুধু নিষ্প্রভই হইল না, ঘৃণার ও অবহেলার বস্তু হইয়া শিক্ষিত সমাজের অপাংক্তেয় হইয়া

এক কোণে পড়িয়া রহিল। আমাদের তৎকালীন অনুন্নত সাহিত্যের এমন শক্তি তখন ছিল না যে উক্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে প্রকৃত রসবস্তুর বা সত্যের কোনও সন্ধান দিয়া ফিরাইয়া আনিতে পারে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ও সংস্কৃতির সংঘর্ষে প্রাচ্যের সে দিন শুধু পরাজয়ই ঘটে নাই, এই সংঘর্ষের ফলে যে হলাহল উত্থিত হইয়াছিল, তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া আমরা আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

বিজয়ী প্রতীচীর নিকট পরাজিত প্রাচী যখন কেবল দেহি দেহি রবে গগন বিদীর্ণ করিতেছিল, সেই যুগসন্ধি ক্ষণে হয় মধুসূদনের আবির্ভাব।

মধুসূদনও ইংরাজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া এবং পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার দুঃসহ প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া কৈশোরেই যুগধর্ম্মে হইয়া পড়িলেন দিক্-ভ্রান্ত ও ভ্রষ্টদৃষ্টি। যদিও মধুসূদন এ মোহ কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু সেটা যে কি ভাবে ঘটিয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমার মনে হয়, মধুসূদনকে আমরা ফিরিয়া পাইয়াছি শুধু তাঁহার বন্ধু গৌরদাস বসাক মহাশয়ের জন্যই।

সাধারণভাবে মধুসূদনকে লোকে Blank Verse বা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক রূপেই জানেন। কিন্তু তিনি যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সকল বিভাগকেই নব নব ঐশ্বর্য্যসম্ভারে সুসমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সে কথা বোধ হয় অনেকে চিন্তা করেন না। এক কথায় এত বড় প্রতিভাধর ও স্রষ্টার আবির্ভাব আজ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় আর হয় নাই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মধুসূদন শুধু অদ্বিতীয় ও অবিস্মরণীয়ই নহেন, তিনি আজও অনতিক্রম্য। মধুসূদনকে অতিক্রম করিয়া যাইতে আজ পর্য্যন্ত কোন কবিই সমর্থ হন নাই।

মধুসূদনের পূর্ব্বে রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রমুখ নাট্যকারেরা ছিলেন। ইহারা সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী বাংলায় নাটক লিখিতেন। মধুসূদনও

বঙ্গসাহিত্যে প্রথম অবতরণ করেন নাট্যকাররূপে। মধুস্দনই সংস্কৃত নাট্যাদর্শ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শেকস্পীয়ারের নাটকের অনুকরণে প্রথম বাংলা নাটক রচনা করেন। তাঁহার পরে গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি নাট্যকারগণ মধুসূদনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই যশস্বী হইয়াছেন।

বাংলা ভাষায় প্রহসনও তিনিই প্রথম রচনা করেন। মধুস্দনের পূর্ব্বে এ বস্তু আমাদের বাংলা সাহিত্যে ছিল না।

গদ্য রচনাতেও মধুস্দনের প্রতিভার অপূর্ব্ব স্ফুরণ হইয়াছিল। হেক্টর বধের গদ্য রচনারীতি, নিখুঁত।

কাব্য বিভাগে মধুস্দনের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ এ বিষয়ে অবশ্য কাহারও মতদ্বৈধ নাই সত্য, কিন্তু এ বিভাগে যে তাঁহার আরও একাধিক দান বিদ্যমান, সে কথার অনেকেই খোঁজ রাখেন না।

বাংলায় সনেট বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা মধুস্দনই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন।

ব্রজাঙ্গনা কাব্যের পূর্ব্বে আধুনিক রীতি ও রুচিসম্মত খাঁটি বাংলা লিরিক বা গীতিকবিতা ছিল না। ব্রজাঙ্গনায় মধুস্দন প্রথম লিরিক কবিতার প্রবর্ত্তন করিলেন। ব্রজাঙ্গনায় মধুস্দন অনেক নূতন ছন্দও সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সেগুলি এখন সুপ্রচলতি।

বীরাঙ্গনা কাব্য অর্থাৎ পত্রচ্ছলে কাব্য রচনারীতিও বাংলায় এই প্রথম। সংস্কৃতে দূতকাব্য আছে, কিন্তু পত্রকাব্য নাই।

ফরাসী কবি La Fontaine-এর অনুকরণে মধুস্দন নীতিমূলক শিশুপাঠ্য কবিতারও প্রবর্ত্তন করেন। "রসাল ও স্বর্ণলতিকা" প্রভৃতি কবিতাগুলি এই জাতীয়।

বাংলা ভাষায় মহাকাব্য রচনারও পথপ্রদর্শক তিনিই। বাংলা

সাহিত্যে মেঘনাদ বধ, শুধু সর্ব্বপ্রথম মহাকাব্যই নয়, অত্যাপি অপরাজিত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মধুসূদন তাঁহার প্রহসনগুলিতে কথোপকথনে যে ভাষা ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, সে ভাষা সম্পূর্ণ আধুনিক এবং আজিও সুপ্রচলিত।

মেঘনাদ বধে মধুসূদন বহু নামধাতু সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। হয়ত তাহার সবগুলিই চলে না, কিন্তু কতকগুলি ত চলিয়াছে। বাংলা ভাষা কি তদ্বারা সমৃদ্ধতরা হয় নাই?

মধুসূদনের তিরোধানে বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াই আমি আমার আজিকার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

"আজি বঙ্গভূমির উন্নতিসম্বন্ধে আর আমরা সংশয় করিব না। * * বঙ্গদেশ রোদন করিতে শিখিয়াছে—অকপটে বাঙ্গালী কবির জন্য রোদন করিতেছে।

যে দেশে একজন সুকবি জন্মে সে দেশের সৌভাগ্য। যে দেশে সুকবি যশ প্রাপ্ত হয়, সে দেশের আরও সৌভাগ্য। যশ মৃতের পুরস্কার—জীবিতের যশ কোথায়? * * যে দেশের শ্রেষ্ঠ কবি যশস্বী হইয়া জীবন সমাপন করেন, সে দেশ প্রকৃত উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে যশস্বী হইয়া মরিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায়, বাঙ্গালা দেশ উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে।

* * * বাঙ্গালা প্রাচীন দেশ। * * কিন্তু এই প্রাচীন দেশে দুই সহস্র বৎসর মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। শ্রীহর্ষ বাঙ্গালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।

যদি কোনও আধুনিক ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত ইউরোপীয় আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন—তোমাদের আবার ভরসা কি? বাঙ্গালীর মধ্যে মনুষ্য

জন্মিয়াছে কে? আমরা বলিব, ধর্মোপদেশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব, দার্শনিকের মধ্যে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও শ্রীমধুসূদন।

স্মরণীয় বাঙ্গালীর অভাব নাই। কুল্লুক ভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র ও রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল।

* * ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল। সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। কাল প্রসন্ন, ইয়ুরোপ সহায়, সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া তাহাতে নাম লিখ— "শ্রীমধুসূদন।"*

---

* ১৯৪৫।২৯শে জুন যশোহর সাহিত্যসঙ্ঘের মধু-স্মৃতি সভায় সভাপতির অভিভাষণ

শিক্ষাসঙ্কট

এডুকেশন কমিটির রিপোর্ট

ভারত গবর্ণমেণ্টের এডুকেশন কমিশনার ১৯৩৪-৩৫ সালে "ভারতে সাধারণ শিক্ষার প্রসার ও ক্রমোন্নতি" বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছেন, সম্প্রতি তাহার রিপোর্ট বাহির হইয়াছে।

এই রিপোর্ট দাখিল করিবার সময় ভারত সরকারের মাননীয় শিক্ষা সচিব মহাশয় বলিয়াছেন—"শিক্ষাবিভাগ যখন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীমণ্ডলের হস্তে সমর্পিত হয়, তখন আশা করা গিয়াছিল যে শিক্ষা-মন্ত্রীগণ নিজ নিজ প্রদেশের উপযোগী করিয়া শিক্ষাবিভাগের তাঁহারা সংস্কার করিবেন এবং বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে যে সব দোষ ত্রুটি ও পরিহর্ত্তব্য বাহুল্য আছে সেগুলির সংশোধন করিবেন। কিন্তু এতদিনের মধ্যে কোনও প্রদেশেই এ বিভাগে কোন উন্নতিই সাধিত হয় নাই; না হওয়ার কারণ, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ছিল স্বার্থের সঙ্গে বিরোধ এবং নিম্নতর শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁহারা ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃসহায়।"

ভারত সরকারের রিপোর্টে আরও প্রকাশ যে, 'বর্ত্তমানে উচ্চশিক্ষার জন্য দেশে একটা জনমত গঠিত হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে সরকার কর্ত্তৃক একটা প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন এমন অনেক ছাত্র আছে যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে অক্ষম এবং এমন কতক ছাত্রী আছে যাহারা কি-সাধারণ কি-বিজ্ঞান উভয় বিভাগেই, উচ্চ শিক্ষা লাভের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কাজেই এ প্রকার ছাত্রসংখ্যার বাহুল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত শিক্ষা যেমন কুণ্ঠিত হয়, তেমনি এই সমস্ত ছাত্রেরও উক্ত শিক্ষায় কোনও ফলই হয় না। শেষোক্ত

ছাত্রদের জন্য তাই অর্থকরী কোনও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা বিশেষ প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যে-শিক্ষা উত্তর-জীবনে ইহারা সত্য সত্যই কাজে লাগাইতে পারে। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ও নিম্নতর বিদ্যালয় হইতেই এরূপ কোন শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী। ভারতে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও এই ধরণের প্রস্তাব ভারত সরকারের নিকট পৌঁছিয়াছে।'

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কি প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা রিপোর্টে নাই।

সাধারণ শিক্ষা যে সকল ছাত্রের উপযোগী নয় এবং হইতেও পারে না, এ ধারণা ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই হইয়াছে, কিন্তু শিক্ষা-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ সে সব প্রস্তাবমত কার্য্য করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, মনে হয়, উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ অর্থের অপব্যয় হয়, তাহা রোধ করিতে না পারিলে, প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যয়ের মত অর্থের সঙ্কুলান করা অসম্ভব।

প্রাথমিক শিক্ষার ভার একেবার স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় যাহা করেন, উপরওয়ালা সরকার তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন না; কিন্তু এত স্বাধীনতা সত্ত্বেও ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা-বিভাগটিই সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা যে ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত ছিল, তাহা একেবারেই না হওয়ায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে শতকরা ৭৪ জনের বর্ণজ্ঞানই হয় না! ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপকগণেরা বলেন, উপযুক্ত অর্থের অভাবেই তাঁহারা আশানুরূপ কার্য্য করিতে পারেন না; কিন্তু দেখা গিয়াছে, যে ব্যয়িত অর্থের বার আনা অপব্যয় হওয়ায়, সমস্ত ব্যাপারটিই হইয়া পড়িয়াছে পণ্ড এবং সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ।

এই প্রাথমিক শিক্ষা-বোর্ডের উপর জেলার কর্ত্তৃপক্ষের সামান্য একটু কর্ত্তৃত্ব থাকে, কিন্তু বোর্ডের সভ্যগণ নিরপেক্ষভাবে কার্য্য পরিচালনা করিলে হয়ত এ প্রচেষ্টা এমন ব্যর্থ হইত না। ইহারা সাধারণ উপ-কারিতার দিকে ততটা নজর দেন না, যতটা দেন ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থ ও নামের উপর। ফলে, এমন স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হয় যেখানে তাহার কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই, অ চ প্রয়োজনীয় স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হয় না অর্থের অসাচ্ছল্যে।

প্রাথমিক শিক্ষার ভার যখন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের উপর প্রদত্ত হয়, তখন আশা করা গিয়াছিল যে, শহর হইতে দূরে, গ্রামে—সহজে যে সব জায়গায় যাওয়া আসা কষ্টকর বা যে সব বিদ্যালয় শহর হইতে পরিদর্শন বা পরিচালনা করা সুকর নয়, এমন সব স্থানে স্থানীয় বোর্ডের হস্তে এ ভার অর্পণ করিলে, স্থানীয় অভাব অভিযোগ ও সুবিধা জ্ঞাত থাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি যথাস্থানেই স্থাপিত হইয়া, সেখানকার অধিবাসী-দের আগ্রহে ও চেষ্টায় ভালই চলিবে, কিন্তু সরকারের সে আশা সম্পূর্ণ-রূপে ব্যর্থ হইয়াছে।

এই বিফলতার প্রধান কারণ, বিদ্যালয়গুলি যথাস্থানে স্থাপিতই হয় না ; দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়ের গৃহ, শিক্ষক প্রভৃতি নির্ব্বাচনেও এতটুকু আগ্রহ বা যত্ন লওয়া হয় না। প্রথম প্রথম একটু আধটু যে সুফল দেখা না গিয়াছিল, তাহা নহে, তবে সে সাময়িক এবং লোকেদের সে উৎসাহসও ছিল নূতনত্বের মোহে ক্ষণিক। স্থানীয় বোর্ডের এই ঔদাসীন্য ও কর্ম্মহীনতার স্থানে সাধারণের সেবা ও উপচিকীর্ষা-বুদ্ধি যতদিন না জাগ্রত হইবে, ততদিন দেশের প্রাথমিক শিক্ষা আশানুরূপ সুফলপ্রসূ কখনই হইবে না। আর প্রাথমিক শিক্ষা যদি যথোচিত না হয়, তাহা হইলে উত্তরকালের উচ্চতর শিক্ষাও যে হইবে পঙ্গু, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার আর কি আছে ?

১৯৩৪ সালে সমগ্র ভারতে শিক্ষালয়ের সংখ্যা ছিল ২৫৬৭২৪ আর ১৯৩৬ সালে হইয়াছে ২৫৬২৬৩ অর্থাৎ ৪৬১টি শিক্ষালয় কমিয়াছে। এই সংখ্যা-হ্রাসের পরিমাণ দেখা যায় মাদ্রাজে ও যুক্তপ্রদেশেই বেশী।

বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমিলেও, ছাত্রের সংখ্যা কিন্তু ক্রমশঃই বাড়িতেছে। ১৯৩২-৩৩ সালে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা একটু অসচ্ছল থাকা সত্বেও, সংখ্যায় ৮৬৯৯৫ জন ছাত্র বাড়িয়াছে।

১৯৩৪-৩৫ সালে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩৩৩৯৭৯ বাড়িয়াছিল। ইহার মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ১৩৫১৯৫, বাকী ১৯৮৭৮৪ ছাত্র। ১৯৩৪-৩৫ সালে ভারতে ছাত্রছাত্রীদের মোট সংখ্যা ছিল ১৩,৫০৬,৮৬৯—অর্থাৎ ভারতের জনসংখ্যার অনুপাতে শতকরা ৫০°৩ ছাত্র এবং ১৬°৫ ছাত্রী মাত্র বিদ্যালয় যাইত।

এইত সংখ্যা! ইহার অর্দ্ধেকের বেশী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত না করিয়াই লেখাপড়া ছাড়িয়া দেয়, ফলে বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যাও কমিয়া যায়। ১৯৩১ সালের হিসাবে দেখা গিয়াছিল যে শতকরা ৭৯ ছাত্র ও ৯০ জন ছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করিয়াই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছিল। ১৯৩৪-৩৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকালেই ভারতে শতকরা ৭৪ জন ছাত্র এবং ৮৭ ছাত্রী বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে। শিক্ষা বিভাগের চেষ্টায় এই ঔদাসীন্য হয়ত কতকটা কমিয়াছে।

সমগ্র ভারতে শিক্ষার বিভিন্ন আয়তনের হিসাব

ছাত্রদের জন্য

	১৯৩৪	১৯৩৫
কলেজ	১০৬১৯০	১০৯৩১৫
উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়	৯১৫১১৪	৯৪৪৯২২
মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়	১১৭৪৬৭৭	১১৭২০৬৫

প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮৩৯৬৯৬৮	৮৬৩৯৪০৫
বিশেষ বিদ্যালয়	২৩৭৩৮৮	২৩৯১৮১

ছাত্রীদের জন্য

	১৯৩৪	১৯৩৫
কলেজ	২১৫৮	২৪৯৩
উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়	৯২৪৩০	৯৮৯৭৫
মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়	১৪০১০১	১৪৬০৪২
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪০৯৩৩০	১৪৫০২৬৭
বিশেষ বিদ্যালয়	১৭৫২০	১৮০৯৫

দেখা যাইতেছে, প্রাথমিক শিক্ষালয়ের সংখ্যা যে ভাবে বাড়িয়াছে, সে হারে উচ্চতর শিক্ষানিকেতনগুলি বাড়ে নাই। বলিতে হইবে, এ বৃদ্ধি ঠিকই হইয়াছে এবং নীচে হইতে গড়িয়া উঠিলেই উচ্চতর বিদ্যা-নিকেতনগুলির সংখ্যা আপনিই বাড়িবে।

বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি

প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ সকল শিক্ষার গোড়াপত্তন যদি সুদৃঢ় না হয়, তাহা হইলে উত্তরকালের উচ্চশিক্ষাও যে পঙ্গু ও ব্যর্থ হইয়া উঠে, তাহা বর্ত্তমান কালের তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত (?) বাঙ্গালী যুবক-যুবতীদিগকে দেখিলেই প্রতীতি জন্মে। এই নিম্ন ও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত নরনারীদের মধ্যে গত ৩০।৩৫ বৎসরে কয়টি নরনারীর নাম আমরা আজ সগর্ব্বে করিতে পারি? একটি প্রতিভার পরিচয়ও কি আমরা পাইয়াছি? বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে যদি কোনও লোকই সত্যকারের শিক্ষা লাভ না করে, তাহা হইলেও কি বলিতে হইবে যে এই শিক্ষা আমাদের উপযোগী? যে বি-এ, এম্-এ পাশ করিয়া ছাত্রছাত্রীরা নিছক বর্ণপরিচয় ছাড়া আর কিছুই শিখে না, সে বি-এ, এম্-এরই বা মূল্য কি?

বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত যুবক-যুবতীগণের মধ্যে অনেককে দেখা গিয়াছে কি-ইংরাজী কি-বাংলা, কোনও ভাষাতেই শুদ্ধ ভাবে একখানি পত্র পর্য্যন্ত লিখিতে পারে না, ইতিহাস-ভূগোলেরও কোন ধার ধারে না, কড়া গণ্ডা ছটকিয়া কাঠাকালি বিঘাকালি মণ সের প্রভৃতি মৌখিক হিসাবেও সম্পূর্ণ অজ্ঞ,হস্তলিখন, সাহিত্যজ্ঞান এবং জাতীয় বা পৌরাণিক কাহিনীর জ্ঞানও তথৈবচ, দৈহিক ও নৈতিক স্বাস্থ্য বিষয়েও উদাসীন, শ্রদ্ধা সম্মান ও ভক্তি কাহাকে বলে তাহাও জানে না, মিতব্যয় ও অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থারও পক্ষপাতী নয়। এই কি বর্ত্তমান সুশিক্ষার সুফল? অথচ বর্ত্তমান শিক্ষার মূল্য বাড়িয়াছে, পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ!! বহু পিতামাতা সন্তানের এই শিক্ষার জন্য সর্ব্বস্বান্ত পর্য্যন্ত হইতেছেন! কিন্তু সন্তান কি শিখিতেছে?

অথচ কিছুদিন পূর্ব্বে প্রাথমিক পাঠশালা ও বিদ্যালয়গুলিতে সত্য-কারের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পূর্ব্বে লোকে ইংরাজী জানিত না বটে, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের মাতৃভাষা ভালই জানিতেন, সাংসারিক হিসাবপত্র নির্ভুল ভাবে করিতে পারিতেন, মাতৃভাষায় চিঠিপত্র লিখিতে ও কথা কহিতেও পারিতেন, দেশের নীতি ধর্ম্ম সমাজের সহিত পরিচয় রাখিতেন এবং যথাযোগ্য সম্মান শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেও জানিতেন। অবসর-যাপনের জন্য তাঁহারা রাশিয়ান্ ফরাসী ও বিলাতী এমন কি বাংলা উপন্যাসও না পড়িয়া, পড়িতেন রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ, যদ্দারা জ্ঞান ও আনন্দ উভয়ই তাঁহারা লাভ করিতেন প্রচুর। হয়ত বর্ত্তমান রুচি ও ফ্যাশানের সহিত ইহার মিল নাই, কিন্তু ইহাতে যে স্বদেশ ও দেশের সংস্কৃতির উপর একটা মমত্ববোধের ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়, সেটি অবহেলনীয় ত নয়ই, বরং বর্ত্তমানে তাহার অভাবে আমাদের অনেক দুর্গতিই সম্ভব হইয়াছে।

সারাদিন নিজ নিজ কাজকর্ম্ম করিয়া সকলে সমবেত হইয়া সন্ধ্যায়

যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতপাঠাদি দ্বারা এমন দুর্লভ আনন্দ তাঁহারা লাভ করিতেন, যাহাদ্বারা সমাজের নৈতিক চরিত্রের ও আত্মিক স্বাস্থ্যের পর্য্যন্ত উন্নতি হইত। তখনকার মানুষদের মনে ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও ঈশ্বরে নির্ভর ছিল প্রচুর; অন্তরে স্নেহ প্রেম দয়া দাক্ষিণ্য প্রীতি ছিল যথেষ্ট; তাঁহাদের হৃদয়ের প্রসারও ছিল অনল্প। অথচ, এ মাত্র ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে। আমরা বাল্যকালে এ সব দেখিয়াছি।

বাহুল্যহীন মিতব্যয় এবং অবিলাসে তাঁহাদের অর্থকৃচ্ছ্রতা এবং দারিদ্র্যও এমন প্রবল না হওয়ায়, জনে জনে, পরিবারে, সমাজে, গোষ্ঠীতে, পল্লীতে সর্ব্বত্র ছিল একটা প্রসন্নতা, একটা নির্ভাবনা, একটা শান্তিময় পরিপূর্ণ আনন্দ। ফলে, দেশের লোক প্রাণ খুলিয়া হাসিতে জানিত, হাসাইতে পারিত, গান গাহিত, কাব্য রচনা করিত, কাব্যরস উপভোগ করিত।

পল্লীর ধূলিমলিন নাটমণ্ডপে বা বৃক্ষতলে কিম্বা কাহারও বহির্ব্বাটিতে বসিত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ। শ্রদ্ধাবান্ ছাত্র পরম আগ্রহে গ্রহণ করিত শিক্ষকের শিক্ষা। গুরু-শিষ্যে ছিল আন্তরিক যোগ। গুরু শিষ্যকে ভালবাসিতেন পুত্রাধিক স্নেহে, শিষ্য দেখিতেন গুরুকে গুরুরই মত। সমাজে এই শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ বিশেষ সম্মানিত ছিলেন, কারণ ইঁহারা চরিত্রে কার্য্যে ব্যবহারে ও জীবনযাপনে ছিলেন তৎ-কালীন্ আদর্শ।

তখন শিক্ষার ব্যয়ও ছিল নিতান্ত সামান্য, সকলেই তাহা বহন করিতে পারিত। প্রাথমিক শিক্ষায় তখন কার্য্যকরী বিদ্যা শিখান হইত। হাতের লেখা ভাল করা, বাণানশুদ্ধ বাংলা লেখা এবং শুভঙ্করী আর্য্যা মুখস্থ করাইয়া, কঠিন জটিল হিসাবেও ছাত্রদিগকে পারদর্শী করা ছিল প্রাথমিক শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য।

আজ ভারতবর্ষ, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশ, যে সব মনস্বী লোকোত্তর

চরিত্র মহামানবদের নামে গর্ব্ব করে, তাঁহারা সকলেই ছিলেন প্রাচীনপন্থী এই সব শিক্ষায়তনেরই ছাত্র। অথচ এই দীর্ঘ ৪০ বৎসরের ক্রমবর্দ্ধমান দুর্ম্মূল্য শিক্ষায় কয়টি ছাত্র দেখা গেল যাহাদের নামে দেশ গৌরব অনুভব করিতে পারে।

আগেকার তালপাতা, শ্লেট, শরের বা খাগ্‌ড়ার কলম, ভুশোর কালি আর নাই, এখন নিত্য নূতন এক্সার্‌সাইজ বুক্‌, খাতা, কাগজ, পেন্সিল, নিব, কালি, ফাউণ্টেন্‌ পেন্‌, রং, তুলি যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয়সাধ্য অনাবশ্যক কত কি! পাঠ্য-পুস্তকের বোঝা—একটা গাধার বোঝা—ছেলে-মেয়েরা নিত্য ঘাঁটে, বহন করে, এবং পড়ে: কোনও বই সম্পূর্ণ, কোনও বই অর্দ্ধেক, কোনও বই সিকি, কোনও বই একেবারেই পড়া হয় না। অথচ বহু অর্থব্যয়ে সমস্ত বই কিনিতেই হয়।

এ বৎসর যে বই পড়া হইল, আগামী বৎসর আর তাহা রহিল না, আবার সব নূতন বই আসিল। ফলে, যদি কোনও ছাত্র দুর্ভাগ্যক্রমে এক ক্লাসে দুই বৎসর থাকে, তাহা হইলে তাহাকে দুই বার দুই সেট্‌ বই কিনিতে হয় এবং নূতন করিয়া পড়িতে হয়। ছেলের অকৃতকার্য্যতায় তাহার অভিভাবকেরও দণ্ড হইল দুইবার বইকেনার জরিমানায়। পুরাতন পুস্তকগুলি পুরাতন জুতার মত, অব্যবহার্য্য রাবিশের মত, ফেলিয়া দেওয়া ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর থাকে না। কিছুদিন পূর্ব্বে পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্ত্তন হইত ৪।৫ বৎসর অন্তর, তাহাতে অকৃতকার্য্য ছাত্রদের যেমন উপকার হইত, দুঃস্থ ছাত্রদেরও তেমনি একটু সুবিধা হইত—কতকগুলি বই তাহারা চাহিলেই পাইত, অন্তত অর্দ্ধমূল্যেও অনেক বই কেনা যাইতে পারিত।

এখন বিশ্ববিদ্যালয় হইয়াছে কতকগুলি গ্রন্থকারের দালাল। প্রতি বৎসর পাঠ্য পরিবর্ত্তন করিয়া ও পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা বাড়াইয়া কর্ত্তৃপক্ষ অভিভাবকগণের কষ্টার্জ্জিত এবং রক্তাপ্লুত অর্থে তাঁহাদের প্রিয়

সৌভাগ্যবান গ্রন্থকারদিগকে অনুগৃহীত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই জুলুম অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত, যেহেতু প্রতি বৎসর পাঠ্য পরিবর্ত্তনের কোনও কারণ নাই, থাকিতেও পারে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা যে এ বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা অধিক চিন্তা করেন, তাহা মনে হয় না, এবং যদি তাহা করেন, তাহা হইলে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে আমরাও এ বিষয়ে তাঁহাদের অপেক্ষা কিছু কম চিন্তা করি না এবং কম বুঝিও না।

জনসাধারণ এখন উচ্চশিক্ষার দিকে ঝুঁকিয়াছে, কাজেই, ছেলে-মেয়েকে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়াইয়া সময় নষ্ট করিতে তাঁহারা নারাজ। ইহারা মনে করেন এ সব পণ্ডশ্রম। অথচ উচ্চ-বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার পরিচয় আমরা নিত্য পাইতেছি! তবু অভিভাবকগণ তাঁহাদের ছেলেদিগকে উচ্চবিদ্যালয়েই দিয়া থাকেন। গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলি পরিত্যক্ত হইয়াই মরিয়া গেল! অথচ এইগুলিই ছিল, ছাত্রদের প্রথম জীবনের নির্ভরযোগ্য একমাত্র ভিত্তিভূমি! বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এখন উচিত অবিলম্বে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রাচীনপন্থী গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলিকে পুনর্জীবিত করিয়া তোলা; এবং ইহার সহিত উচ্চ বিদ্যালয়কে অচ্ছেদ্যরূপে সংযুক্ত করা।

তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালীদের দ্বারা পরিচালিত কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় বাঙালীর ছেলের মন জানে না, তাহাদের অভিভাবকদের সামর্থ্য বোঝে না, বাঙালীর ছেলের সত্যকারের কি প্রয়োজন তাহাও জানে বলিয়া মনে হয় না। বাঙালীর ছেলে মেয়ে কি করিলে সত্যকারের বাঙালী হয়, তাহাও হয়ত ইহারা ভাবেন না। অথচ ইহারাই আমাদের শিক্ষার কর্ণধার!!

আমার মনে হয় বাংলায় শিক্ষার সংস্কারের পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমূল সংস্কার ও দায়িত্ববোধ জাগরণই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঔদাসীন্য

যদি প্রশ্ন করি, গত ১০০ বৎসরের মধ্যে ভারতের শিক্ষা-বিভাগ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের শিক্ষার জন্য সত্যকারের কি এবং কতটা-কি করিয়াছেন, তাহা হইলে প্রশ্নটি অন্যায় ত হইবেই না, বরং এ যে খুবই সময়োচিত এবং ন্যায্য, তাহাতেও সন্দেহ নাই, কিন্তু উত্তর দিবে কে?

১৮৩৫ সালে লর্ড মেকলের বিখ্যাত ডেস্প্যাচে যে সব সংস্কারের কথা ছিল, এখন যদিও সেগুলি অসাময়িক, তখনই বা তাহার কয়টিকে কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছিল? ১৮৫৪, ১৮৮৩, ১৯০৪ এবং ১৯১৭ সালে এক একবার বহু অর্থব্যয়ে ও বহ্বাড়ম্বরে এক একটি কমিশন বসান হইয়াছে, বহুদিন যাবৎ বহু লেখাপড়া সাক্ষ্যসাবুদ প্রভৃতির দ্বারা বহু ঢক্কা নিনাদে বাজার সরগরম করা হইয়াছে—কিন্তু কার্য্যতঃ তেমন কিছুই হয় নাই! আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই—পূর্ব্বেও যেমন ছিলাম, এখনও তেমনি আছি এবং ভবিষ্যতেও যে তেমনি থাকিব, ইহাও নিশ্চিত।

অথচ, পূর্ব্বাপেক্ষা যতই দেশে শিক্ষিতের (?) এবং ডিগ্রিধারীর সংখ্যা বাড়িতেছে, ততই অসন্তোষের মাত্রাও বাড়িয়া চলিতেছে। পূর্ব্বে ইংরাজী শিক্ষা করিলে লোকের অবস্থানুযায়ী অন্নবস্ত্রের যাহা হউক একটা ব্যবস্থা হইত: দেশে হউক্ বিদেশে হউক্, যাহা হয় একটা চাকরী জুটিত—ইংরাজী শিখিয়া লোকে সাধারণ উদরান্নের জন্য এক প্রকার নিশ্চিন্ত থাকিত। কিন্তু এখন? এখন ইংরাজী-শিক্ষিত-দের মধ্যেই প্রবল অসন্তোষ, কারণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়া এবং বড় বড় ডিগ্রিলাভ করিয়াও, তাহারা সামান্য একবেলা উদরান্নের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না। অথচ প্রতি বৎসর এই পাশের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে।

পাশ করিয়া ছাত্রছাত্রীরা শিখিতেছে নাও তেমন কিছু, এবং রোজগারও করিতে পারিতেছে না এক পয়সা; কাজেই যে পাশ করে, সাংসারিক অভাবে সে হয় অসন্তুষ্ট, আর যাহারা সে শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করে, তাহারাও হয় ক্রুদ্ধ—তাহাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থের অপব্যয় দেখিয়া।

অতএব এ শিক্ষার বা শিক্ষালয়ের কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া ত মনে হয় না। অন্ততঃ বর্ত্তমান বাংলায় এই দুর্ম্মূল্য শিক্ষায় যখন বিশ্ব-বিদ্যালয় ও গ্রন্থকার ছাড়া আর কাহারও অন্নসমস্যার সমাধান বা সংস্থান হয় না, তখন কেহ কেহ বলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উঠিয়া গেলেই বা দেশের ক্ষতি কি হইবে? বিশ্ববিদ্যালয় উঠিয়া গেলে ক্ষতি নিশ্চয়ই হইবে, কারণ এই স্বল্প শিক্ষা হইতেও আমরা বঞ্চিত হইব।

১৮৫৪ সালে সার চার্লস উড্ বলিয়াছিলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত সমস্ত শিক্ষার পশ্চাতেই যেন ছাত্রের উত্তর জীবনের সাফল্য নির্ভর করে। সার্ চার্লসের এই ডেস্প্যাচে ভারতীয় ছাত্রগণকে বিশেষ করিয়া তিনি কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী করিতে বলেন, কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন, ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি এবং ব্যবসা বাণিজ্যে সাফল্য লাভ একমাত্র কৃষিকার্য্যের উপরেই নির্ভর করে। যে দেশের কৃষিই একমাত্র পন্থা, সেখানে উন্নত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রথম হইতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিলে, দেশের মঙ্গলই হইবে—মনে করিয়া, সার চার্লস্ ভারতে কৃষিবিদ্যাকে প্রাধান্য দিয়া-ছিলেন, কিন্তু আজিও তাহা কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই।

১৮৭১ হইতে ১৮৮২ সালের মধ্যে বহু উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্ম হয়, কিন্তু তাহাতে থোড় বড়ি খাড়া ও খাড়া বড়ি থোড় ছাড়া আর কিছুই হয় নাই। কারণ, এই উচ্চ ইংরাজী শিক্ষার মোহে, কতকগুলি

লোক তখন মাত্র এনট্রান্স পাশ করিয়াছিলেন। এই এনট্রান্স পরীক্ষা প্রবর্ত্তনের একটা উদ্দেশ্য ছিল।

সে সময়ে ইস্কুল হইতেই ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৌঁছিতে পারিত, অথচ সেখানে গিয়া অনেকে তেমন সুবিধা করিতে পারিত না। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের একটা সাধারণ যোগ্যতা নির্দ্ধারণ করিবার জন্যই এনট্রান্স পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল এবং এখনও তাহাই চলিয়া আসিতেছে।

১৮৮২ সালের কমিশনে কর্ত্তৃপক্ষ বলিলেন, এনট্রান্সের শিক্ষা আশানুরূপ নয়, ইহাকে আরও উন্নত করা হউক। তাহাই হইল, অর্থাৎ কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় পুস্তক ও বিষয় সন্নিবেশিত হইল মাত্র। ছাত্রদের পুঁথিগত বিদ্যা ও তোতাপাখীর মত মুখস্থ শক্তি বাড়াইয়া এনট্রান্স পরীক্ষাকে সমাগত উচ্চতর শিক্ষার সোপান রূপে নির্দ্ধারিত করা হইল। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার দিকে কাহারও নজর পড়িল না। দিন দিন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা যেমন বাড়িতে লাগিল প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলিও ঠিক সেই অনুপাতে কমিতে লাগিল, কারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে এনট্রান্স স্কুলগুলির কোনও সংযোগ রহিল না। তখনও ছিল না, এখনও নাই। অথচ কমিশন বসিতেছে, বিশ্ববিদ্যালয় নিত্য নব নব ফতোয়া জারি করিতেছে, শিক্ষাসচিব শিক্ষাবিভাগে নানাবিধ গালভরা নামে মোটা মোটা বেতনে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেছেন, শিক্ষাতন্ত্রের উন্নতিসাধন কল্পে!!

১৮৮২ হইতে ১৯০২—অর্থাৎ এই বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলি মুমূর্ষু হইয়া উঠিল; কারণ, ইংরাজী শিক্ষার মোহে হাই-স্কুলগুলিরই রক্তচাপ বর্দ্ধিত হইল, প্রাথমিক শিক্ষা রক্তহীনতায় ও দুর্ভিক্ষে মরিতে লাগিল। অথচ তথাকথিত এই উচ্চশিক্ষায় দেশের জনসাধারণ তেমন যোগ দিল না, যদিও তাহাদের উপযোগী প্রাথমিক

শিক্ষালয়গুলির অকাল মৃত্যুতে দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেদের ছেলে-পিলেদের যেটুকু শিক্ষা হইতেছিল, তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। ফলে, যাহারা এই ব্যয়সাপেক্ষ ইংরাজী শিক্ষায় ঝুঁকিল, তাহারা চাকরীজীবী। কাজেই তাহারা ঝুঁকিল উদরান্ন-সংস্থানের ভরসায় অনন্যোপায় হইয়া, আর যাহাদের খাটিয়া খাইতে হয়, তাহাদের অন্নসমস্যা তখন এত প্রবল না হওয়ায় তাহারা শিক্ষাই পরিত্যাগ করিল। সামান্য বর্ণজ্ঞান ও শুভঙ্করীর হিসাব শিখিয়া যাহারা নিজ নিজ ব্যবসা চালাইত, সেই বিপুল জনসমাজ বর্ণজ্ঞানহীন সম্পূর্ণ অশিক্ষিতই রহিয়া গেল !! ১৮৮২ সালের কমিশনে ফল হইল, দেশে বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা কোথায় বাড়িবে, না কমিয়াই গেল !

১৯০২ সালে যে কমিশন বসিল, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার-সাধনই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে ঢালিয়া গড়িতে উপদেশ লাভ করিবার জন্য আমরা বহু অর্থব্যয়ে এই কমিশনের ব্যয় বহন করিয়াছি। এ কমিশনে ইস্কুলের কোন কথাই নাই, অন্যান্য বহু বড় বড় কথা আমরা শুনিয়াছি !! অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ ব্যাধিগ্রস্ত, গলিত কুষ্ঠে অকর্ম্মণ্য, ইহারা বলিলেন, মুখটা যেন সুন্দর দেখায়। অতএব মুখে রং মাখাইয়া, চুল ছাঁটাইয়া, পরচুলা পরাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে সংস্কৃত করা হইল। যেন বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহার সহিত প্রাথমিক শিক্ষা, এমন কি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের পর্য্যন্ত কোনই আন্তরিক সম্বন্ধ নাই।

এই সব হইতে দেখা যাইতেছে যে, এদেশে দেশের উপযোগী শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও বিস্তার করিবার জন্য সরকারও যেমন কিছু করেন নাই, দেশের লোকও তেমনি কিছুই করে নাই। দেশবাসী গড্ডালিকাপ্রবাহে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া যাহা হইতেছে, তাহাতেই পরিতুষ্ট হইয়া দিন কাটাইয়াছে। দেশের লোক কোন দিনই সরকারের কাছে তাহাদের

প্রকৃত প্রয়োজন যে কি তাহা জানায় নাই, যাহা চাহিয়াছে তাহাও আংশিক, এবং অসম্পূর্ণ, কাজেই রাজসরকারের নিষ্ক্রিয়তা অপেক্ষা দেশবাসীর ঔদাসীন্য ও অজ্ঞতাই এই পরিস্থিতির জন্য সমধিক দায়ী।

১৮৩৫ সালে ডবলু আডাম্‌স্‌-এর রিপোর্টে প্রকাশ যে, সেকালে সমগ্র বঙ্গদেশে অগণিত পাঠশালা ছিল, কিন্তু সেগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা না দেশবাসী না সরকার কেহই কখনও করেন নাই। অথচ এই পাঠশালাই ছিল তখনকার প্রকৃত শিক্ষালয়ের সোপান।

এখন আমাদিগকে আবার সেই পাঠশালার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলিকে উন্নত করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে এই পাঠশালা পর্য্যন্ত অচ্ছেদ্যভাবে প্রসারিত হইতে হইবে। দেশের শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষার প্রণালীরও আশু পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, দেশ কাল ও পাত্র অনুযায়ী শিক্ষিত লোকেরা যেন সত্যকারের শিক্ষালাভ করিয়া তাহাদের উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে।

আমাদের দেশের শিক্ষার সমস্ত ভারই গভর্ণমেণ্টের হাতে। যেটুকু বেসরকারী, সেটুকুও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় না। তাহার কারণ, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষার ফলে, সত্য বলিতে কি, কেহই পরিতুষ্ট নহেন, অথচ কেহই ইহার উন্নতি ও সংস্কারকল্পেও কিছু করেন না। ইহাও সত্য যে, কিছু করিতে গেলেও তাহা সফল হয় না, কারণ সরকার বলিবেন, হয় অর্থাভাব নয় অনধিকারচর্চ্চা। অন্যান্য হাজার বিষয়ে রাজকোষ হইতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে সেখানে কখনও অর্থাভাব ঘটে না, অর্থাভাব হয় কেবল শিক্ষার জন্য ব্যয়ের কথা উঠিলে। অথচ নিত্য একটা কমিশন, কমিটি, দপ্তর খুলিয়া বিদেশী বিশেষজ্ঞ আনিয়া যে টাকাটা খরচ হয়, তাহা অবহেলনীয়ও নয়। উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগকে যে হারে বেতন দেওয়া হয়, তাহা

ইংলণ্ডেও দেওয়া হয় না, জগতে আর কোথাও এরূপ উচ্চহারে বেতন বোধ করি প্রচলিত নয়।

পরাধীন পরনির্ভর জাতির যাহা স্বাভাবিক, আমাদের তাহাই ঘটিয়াছে।

দেশবাসীও তেমন করিয়া কোন দিনই সরকারকে জানায় নাই যে রাষ্ট্রীয় অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় জাতির শিক্ষাও কম প্রয়োজনীয় নয়। দেশের নেতাগণ দেশের স্বাধীনতা কামনা করেন, কিন্তু দেশবাসীরা যদি অশিক্ষিত থাকিয়া যায়, তাহা হইলে, স্বাধীনতারক্ষা করিবে কাহারা? ইহাদের সেদিকে দৃষ্টি নাই। বিশ্ববিদ্যালয় একটি শালগ্রাম, তাঁহার শয়ন ও উপবেশন দুইই সমান। নাম-কো-ওয়াস্তে এখানে ইহারা আসেন, নিজের নাম বাঁচাইয়া ও আত্মপ্রসাদে বিভোর হইয়া কিছুদিন দিন-গুজরান করিতে, সত্যকারের জনসেবায় ও জাতির কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হইয়া ইঁহারা আসেনও না, কাজও করেন না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয় লইয়া আজ আমাদিগকে এত অপ্রিয় আলোচনা করিতে হইত না, এবং ইহার শিক্ষাও জনসাধারণের উপযোগী এবং কল্যাণকর হইত।

আজ পর্য্যন্ত শিক্ষার সংস্কার ও উন্নতিকল্পে যতগুলি কমিশন বসিয়াছে, সেগুলির পশ্চাতে বহু অর্থব্যয় হইলেও, ফল এক পয়সারও হয় নাই। মাঝে মাঝে এই হৈ চৈ ও লম্বা লম্বা কথাপূর্ণ শূন্যগর্ভ ব্যাপারে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃত কার্য্য ঢের বেশী হইতে পারিত যদি আমাদের দেশবাসী ও সরকার শিক্ষা-বিভাগটিকে সত্যকারের শিক্ষা-বিভাগ করিয়া গড়িয়া তুলিতে প্রয়াসী হইতেন। কিন্তু সরকার তাহা হন নাই, কারণ হয় ত তাঁহারা চাহেন না যে আমরা শিক্ষিত হই। বরং আমাদের অশিক্ষিত থাকায় বা কুশিক্ষিত হওয়ায় তাঁহাদের সাম্রাজ্যপ্রাণ স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত হইবে বলিয়া তাহারা

মনে করেন। যাঁহারা উপরওয়ালা বা উপরে থাকিতে চাহেন, তাঁহারা নীচের যাহাতে জ্ঞান না বাড়ে, সেদিকে সর্ব্বদা সজাগ থাকেন; ভগবানও মানুষকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, পাছে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের হানি হয় এই আশঙ্কায়। সৃষ্টিকর্ত্তা হাতী সৃষ্টি করিয়া, হাতী যাহাতে তাহার সম্পূর্ণ বিরাট শরীরখানা না দেখিতে পায়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন, পাছে হাতী তাঁহার সৃষ্টি ধ্বংস করিয়া ফেলে। জ্ঞানই যে শক্তি। বড়রা ছোটকে চিরদিন শক্তিহীন করিয়াই রাখিতে চাহেন।

দেশে ইংরাজশাসনের পূর্ব্বে কি শিক্ষা দেশের লোকের ছিল এবং পরে কি শিক্ষা সত্যকারের উপযোগী ও উপকারী, কি শিক্ষা লোকে চায়, পুরাতন শিক্ষাপ্রণালীতে কোথায় গলদ, পুরাতনকে বজায় রাখিয়া বা পরিত্যাগ করিয়া বা পরিবর্ত্তন করিয়া দেশের বর্ত্তমান যুগোপযোগী শিক্ষা কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারে—এ সব শুধু মুখের কথাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। দেশবাসী রাজসরকারে কি কখনও এ প্রকার গঠনমূলক কোনও প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কি এ সম্বন্ধে কখনও কোনও গবেষণা করিয়াছেন?

দেশের জনসাধারণ অন্নবস্ত্রের চিন্তায় এ সব বিষয়ে চিন্তা করে নাই, করিবার প্রয়োজনও বোধ করে নাই—যেহেতু তাহাদের কথা কর্ত্তৃপক্ষ শোনেন না। তাহারা চাহিয়াছে আপাতমধুর দুই একটা পাশ করিয়া কেরাণীগিরি, যদ্বারা কোনও প্রকারে দুই বেলা না হউক, একবেলার মতও এক মুঠা অন্নের সংস্থান। সরকার-পরিচালিত কাষ্ঠপুত্তলি বিশ্ববিদ্যালয় তাই এতকাল প্রতি বৎসর হাজারে হাজারে কেরাণী তৈরী করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে। কিন্তু সময় এখন এমন আসিয়া পড়িয়াছে যে, এই সব অপ্রয়োজনীয় কেরাণীরা এখন বেকার। লেখাপড়া কিছু শিখুক আর নাই শিখুক, ক্রমবর্দ্ধমান ডিগ্রিধারী বেকারগণের

আর্ত্তনিনাদে জনসাধারণের কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইয়াছে, কিন্তু সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণে যে শব্দ পৌঁছিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

স্বদেশী আমলে ঝোঁকের মাথায় বহু জাতীয় শিক্ষায়তন গড়িয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু আজ তাহার কয়টি জীবিত? বোধ হয় একটিও না; কারণ, সরকার সে গুলির ললাটে তিলক দান করেন নাই। দেশের লোকও সরকারকে আমাদের দাবী জানাইতে পারে নাই। কাজেই দেশের অভাব অভিযোগে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং উদাসীন বিদেশী রাজসরকার যাহা করিয়াছেন এবং করিতেছেন তাহাই হইতেছে: দেশের লোকের কি দরকার সেটা তাঁহাদের দেখিবার অবসর নাই। একটা কিছু করা দরকার, তাঁহারা করিতেছেন।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি, আবার সেই কথারই পুনরুক্তি করিতেছি যে, যত দিন আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার আশানুরূপ সুসংস্কার না হয়, ততদিন এই ব্যয়বহুল শিক্ষাহীন উচ্চশিক্ষাও (?) হইবে, এমনি নিষ্ফল ও ব্যর্থ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কি কিছু করিয়াছেন? দাতাগণের নিকট কি কখনও কেহ এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন? দাতাগণ দান করিতেছেন, সেই টাকায় ছাত্রদিগকে বৃত্তিদান, পদকদান, বিদেশে প্রেরণ প্রভৃতি বহু পরের কাজ হইতেছে, অথচ আগের কাজে কাহারও নজর নাই। যে অর্থে দেশের ৫০০ ছাত্রকে প্রাথমিক ও কার্য্যকরী শিক্ষা দিয়া, প্রদত্ত ধনের রীতিমত সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারিত, দাতাগণ সেই টাকায় মাত্র একজন বা দুই জনকে বিষয়-বিশেষে সুশিক্ষিত করিয়া দেশের কি উপকার করিতেছেন?

আসল কথা, বিশ্ববিদ্যালয় এ সব বিষয়ে কখনও কিছু চিন্তা করা দূরে থাকুক্, এগুলিকে এ যাবৎকাল অবহেলা করিয়াই আসিয়াছেন।

প্রাথমিক শিক্ষাকে পরবর্ত্তী উচ্চতর শিক্ষার সোপানরূপে গড়িয়া, আপামরজনসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রবর্ত্তিত করিতে না পারিলে, দেশের শিক্ষা দিন দিন যেমন অধোমুখেই ধাবিত হইবে, তেমনি সাধারণের মনও শিক্ষাবিমুখ হইয়া পড়িতেও দেরী হইবে না। সুলভে প্রাথমিক শিক্ষপ্রদানের ব্যবস্থা করিলে এবং সেই শিক্ষার সহিত হিসাব হস্তলিখন এবং সাধারণ ব্যবসায়ের প্রথম-পাঠ থাকিলে, দেশের জন-সাধারণও এ শিক্ষা সাদরে গ্রহণ করিবে। এতদ্বারা বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন (Literate) লোকের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িবে। যদিও তাহাদের অনেকেই উচ্চশিক্ষার প্রবেশদ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছিবে না, তবু তাহাদের বর্ণজ্ঞানের সঙ্গে উত্তরকালে জীবনধারণের উপযোগী বৈষয়িক কর্ম্মেও এ শিক্ষা যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা আমরা নির্ব্বুদ্ধিতা বলি; কিন্তু বুদ্ধির মহাসমুদ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিলে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আর উঁচুতে থাকে না।

বর্ত্তমান শিক্ষা

ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ম্যাট্রিক, আই-এ, আই-এস্-সি, বি-এ, বি-এস-সি বা এম্-এ, এম্-এস্-সি পাশের সংখ্যা এত ছিল না। হয়ত ইহার অর্দ্ধেক ছেলে পাশ করিত। মেয়েদের সংখ্যা ছিল এত কম যে সে না-থাকার মধ্যেই। এখন ছেলেরা ও মেয়েরা হাজারে হাজারে পরীক্ষা পাশ করিতেছে, প্রতি বৎসর এই পাশের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিতেছে। স্কুল কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের আর সংকুলান হয় না। কোনও বিশেষ স্কুলে বা কলেজে কোনও ছাত্র বা ছাত্রীকে ভর্ত্তি করাইতে হইলে, অভিভাবকগণকে বিশিষ্ট কোনও লোকের সুপারিশ লইয়া আবেদন করিতে হয় এবং অনেক কাঠ-খড়ি পোড়াইয়া তবে পুত্র-কন্যাকে সেই বিদ্যায়তনে ঢুকাইয়া চরিতার্থ হইতে হয়। সারা বাংলা-

দেশে এখন আপামরসাধারণ ভদ্র-অভদ্র ধনী-নির্ধন সকলেই নিজ নিজ পুত্রকন্যাকে সুশিক্ষিত (?) করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। অভিভাবকগণ নিজে অনশনে অর্দ্ধাশনে থাকিয়া, অত্যন্ত কষ্টে, পশুর আবাসস্থলেরও অযোগ্য এমন অসম্ভব স্থানে বাস করিয়া, তাঁহাদের দেহরক্তের অপেক্ষাও প্রিয়তর ক্লেশার্জ্জিত অর্থ, পুত্র-কন্যার শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতেছেন। রোগে চিকিৎসা হয় না, সংসারে অভাব ঘুচে না, পরিবারের দুঃখ মোচন হয় না, কন্যার বিবাহ হয় না, সামাজিকতা এবং ভদ্রতা পর্য্যন্ত রক্ষা করিবার অবস্থা থাকে না—তবু অভিভাবকগণ তাঁহাদের পুত্র-কন্যাদের শিক্ষার গুরু এবং ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া পুত্রকন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠান—পুত্র-কন্যাকে তাঁহাদের নিজেদের দুঃখভারের এক কণাও জানিতে দেন না! তাহারাও জানিতে চাহে না, জানিয়াও না-জানার ভাণ করে। ছেলেরা মনে করে, এ পিতা-মাতার কর্ত্তব্য।

শহরবাসী যাঁহারা তাঁহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। আর কয়জনই বা শহরে বাসা করিয়া থাকিয়া ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতে পারে? ছাত্র-ছাত্রীদের পনের আনা না হউক বার আনা ভাগ পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়া শহরে প্রবেশ করিয়াই, গিয়া পড়ে একটা বিলাস-ব্যসন রাক্ষসীর দুর্ব্বার মুখবিবরে। তাহারা ভুলিয়া যায়—কোথা হইতে আসিয়াছে, কি করিতে আসিয়াছে, কি তাহাদের শক্তি, কি করিয়া তাহাদের অভিভাবকেরা এই পাঠব্যয় বহন করিতেছেন। নগরীর চিরোজ্জ্বল মরীচিকায় প্রলুব্ধ হইয়া অতিক্রান্ত তাহারা উপনীত হয় মৃত্যুকালিদহের উপকূলে। ফলে, তাহারা শান্ত পল্লীজীবনের অনাড়ম্বর স্বচ্ছন্দ শান্তি ও সন্তোষ হারাইয়া ফেলিয়া, উৎকট নাগরিক জীবনের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। দারিদ্র্যকে তাহারা ভাবে লজ্জা, সত্যের সঙ্গে স্থাপন করে ভাসুর-ভাদ্রবধূ সম্বন্ধ, অপ্রয়োজনীয় পরিহর্ত্তব্য অনুচিত

অসাধ্য বিলাসে ও অনুকরণে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া বরণ করিয়া লয় অকুশল কলুষিত অকর্ত্তব্য ও অপকর্ম্মের আপাতমনোহারী অমিত অভ্যাস।

পঠদ্দশায় পাঠ হইয়া পড়ে গৌণ, বিলাস ও ব্যসন হইয়া দাঁড়ায় মুখ্য। এ যুগের ছাত্র-ছাত্রীগণের মধ্যে এই কারণে বিলাস অত্যন্ত প্রসার লাভ করিয়াছে। এ যুগের ছাত্র বা ছাত্রীদিগকে দেখিলে কখনই কেহ বুঝিতে পারিবে না যে, তাহারা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের ছেলেমেয়ে। তাহাদের কথাবার্ত্তা আচারব্যবহার চালচলন সব হইয়া দাঁড়ায় ধনী নাগরিকদের অনুকৃতি। এক কথায়, সকলেই হইয়া পড়ে এক একটি রাজামহারাজার বংশধর!! অথচ আমরাই বাল্যকালে দেখিয়াছি গরীব মধ্যবিত্তদের ছেলেরা (তখন মেয়েরা স্কুল কলেজে বড় যাইত না) নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী পোষাক পরিত, পিতামাতার দুঃখে কষ্টে সমব্যথী ছিল এবং সাধ্যানুযায়ী মিতব্যয়ীও হইত!

যে যেমন পারিত লেখাপড়া শিখিয়া একটা আধটা পাশ করিয়া অর্থোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করিত, কারণ তাহার মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিত, তাহার পিতামাতা কি কষ্টে তাহাকে মানুষ করিয়াছেন, এবং সে কি দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া বাঁচিয়াছে। আমরা অনেক বড়-লোককে তাঁহদের বাল্য-জীবনের দুঃখ-দৈন্যের কথা অকপটে বলিতে শুনিয়াছি। এখন দারিদ্র্যকে লজ্জা মনে করিয়া, দরিদ্রেরা তাহাকে প্রাণপণ শক্তিতে ঢাকিতে চেষ্টা করে।

পূর্ব্বে বি-এ, এম-এর এত ছড়াছড়ি ছিল না, অধিকাংশই এনট্রান্স বা প্রথম পর্ব্বের ম্যাট্রিক পাশ। ইহারা যে পরিমাণ লেখাপড়া শিখিতেন, যে প্রকার সুনীতি ও বিবেচনাশক্তি লাভ করিতেন, যে রকম সুবুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তির অধিকারী হইতেন, অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, এ যুগের বি-এ, এম্-এ পাশকরা ছেলেদের মধ্যে

শতকরা ২।৩টি ছেলেও সে প্রকার জ্ঞানলাভ করে কি না সন্দেহ! অথচ, এখন ঘরে-ঘরে বি-এ আর এম্-এ পাশ-করা ছেলে ও মেয়ে !!

পাশ করিয়া উপার্জ্জন করার কথা আমি বলিতেছি না, কারণ লেখাপড়া শেখা ও টাকা রোজগার করা দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ শক্তি। টাকা উপায় করার মূলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যে সব সময় প্রয়োজন, তাহাও নহে। কাজেই লক্ষ্মীলাভ করা সকল সময়েই ভাগ্যের উপর নির্ভর করে, যে ভাগ্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজটীকা দ্বারা প্রলুব্ধ করা যায় না।

আমার বক্তব্য, পাশ-করা ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা লইয়া। বর্ত্তমান কালে পাশ-করা ছেলে মেয়েদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষা কতটুকু হইতেছে ইহাই আমার আলোচ্য। আমি জানি এবং বিশেষ ভাবেই জানি, এ যুগের গ্রাজুয়েটদের মধ্যে অতি অল্পই শুদ্ধভাবে ইংরাজী বা বাংলা ভাষায় রচনা করিতে পারে। কয়জন নির্ভুল বাণান লিখিতে পারে? কয় জন ইংরাজী বা বাংলায় শুদ্ধভাবে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া একখানি চিঠি লিখিতে পারে? ইংরাজী ও বাংলায় কয়টি কথা তাহারা শিখিয়াছে? বর্ত্তমানের শিক্ষিতগণ কি এ সব ভাবিয়া কখনও আত্মজিজ্ঞাসা করিয়াছেন?

যে বিদ্যার্জ্জনের জন্য এই সব ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকগণ সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন, সেই বিদ্যাই ছেলে-মেয়েরা কতটুকু আয়ত্ত করিতেছে? এই নবার্জ্জিত অবিদ্যার স্বায়ত্ত-শাসনে পিতামাতাকে পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে! এ শিক্ষার যদি এই মারাত্মক পরিণাম হয়, তাহা হইলে জনসাধারণের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের কি এ দিকে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার সময় এখনও হয় নাই?

শিক্ষার ব্যয় গত ২০।২৫ বৎসরে ছয়গুণ বাড়িয়াছে, অথচ শিক্ষার উৎকর্ষ (quality) কমিয়াছে ৫০ গুণ, সংখ্যা (quantity) বাড়িয়াছে

১০ গুণ। এখন, শিক্ষার উৎকর্ষই যদি কমিল, সংখ্যা বৃদ্ধি লইয়া তবে কি করিব ?

এক কথায়, বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে ছেলে-মেয়েরা কিছুই শেখে না, বই মুখস্থ করিয়া কেবল পাশ করে মাত্র। জগতে এত সস্তা পাশ আর কোনও দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে কি না জানি না। আমার মনে হয় অশিক্ষিত ও কুশিক্ষিত পাশের এই সংখ্যাধিক্য এবং সুলভতাই দেশের অর্থ নৈতিক সমস্যার একমাত্র কারণ।

ছেলেদের ও মেয়েদের একই শিক্ষা কি সমীচীন ?

অনেকে পাশের সংখ্যাধিক্যের পক্ষপাতী, তাঁহারা শিক্ষার উৎকর্ষ বিষয়ে ততটা মনোযোগী নহেন। ইঁহারা বলেন, আমাদের দেশে এখন কিছু শিক্ষিত (?) অর্থাৎ পাশ-করা লোকেরই প্রয়োজন। আমার মত অন্য। আমি চাই সত্যকারের শিক্ষিত লোক—যদিও শিক্ষিত বলিতে পাশ-করাই আমি সব সময়ে বুঝি না। পাশ না করিয়াও যে যথেষ্ট শিক্ষিত হওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত সকল দেশেই যেমন প্রচুর, আমাদের দেশেও তেমনি বিরল নয়। অথচ পাশ করা অশিক্ষিত কেবল আমাদের দেশেই সম্ভব হইয়াছে। অন্য দেশে পাশকরা ও শিক্ষিত একার্থবাচক, কিন্তু আমাদের দেশে কেবল তাহার বিকল্প ঘটিয়াছে। আর ইহার জন্য একমাত্র দায়ী আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনাকালে যে থোড়-বড়ি-খাড়ার প্রচলন হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত তাহাই চলিতেছে—মাঝে মাঝে ধুমধাম ও মহাসমারোহ করিয়া এটা-সেটা একটু-আধটু এদিক-ওদিক করিয়া খাড়া বড়ি থোড়ের যখন প্রবর্ত্তন হয়, তখনই দেশময় একটা প্রচণ্ড হৈ চৈ পড়িয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়জয়কার পড়ে—টেক্‌ষ্টবুককমিটি, গ্রন্থকার, গ্রন্থ-প্রকাশক গ্রন্থ-বিক্রেতা প্রভৃতি সকলে সমস্বরে পরমার্থলাভের

আশায় ঐকতানে বৈতালিকের গান গাহেন। অন্য লোকের কথা সেই গোরগোলে চাপা পড়িয়া যায়!

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণ যাহা-হউক-একটা-কিছু করিয়া পরম পরিতুষ্ট থাকেন। যাঁহারা বেতন পান না, তাঁহারা নিঃস্বার্থ পরোপকার এবং দেশের ও দশের সেবার আত্মপ্রসাদে বিভোর হইয়া পড়েন। ছাত্রছাত্রীর পিতামাতা ও অভিভাবকগণ আছেন, যাঁহারা রাজকর যোগাইবেন। চিন্তা কি?

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-সংস্কারের কি এখনও সময় হয় নাই? তাঁহারা যদি না জানেন, বা না বুঝেন যে বাংলা দেশে ছেলে মেয়েদের জন্য কি পাঠ্য হওয়া উচিত, তাহা হইলে সে দোষ তাঁহাদের ততটা নয়, যতটা ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদিগের। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণের ছেলেমেয়েরাও ত পড়ে! তাঁহারা কি বুঝেন না যে কি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে? অভিভাবকগণের অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় চলে, তাঁহারা যদি তাঁহাদের দাবী জানাইতে পারিতেন, তাহা হইলে হয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের চেহারা আজ অন্য রূপ হইত! কিন্তু, তাহা হয় নাই,কাজেই ইহারা সাধারণের অর্থে ছিনিমিনি খেলিতে এমন সাহসী। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ কি জানেন না, শিক্ষার উৎকর্ষ (quality) তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষায় বর্ত্তমানে কতটা আহত হইয়াছে? যদি তাঁহারা জানিয়াও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলিব তাঁহারা দোষী, সাধারণের অর্থের অপব্যবহার করাইয়া তাঁহারা জাতির সর্ব্বনাশ করিতেছেন—সমগ্র ছাত্রছাত্রী ও তাহাদের অভিভাবকদের নিকট তাঁহারা ঘোরতর অপরাধী। আর যদি তাঁহারা না জানিয়া গোলে হরিবোল দিয়া এতদিন দিন কাটাইয়া থাকেন, তাহা হইলে বলিব, তাঁহারা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, দেশের শিক্ষার ভারগ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য!

শিক্ষার ভার যাঁহাদের হাতে, তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যের ফলাফল কি নিরীক্ষণ করেন না? যে-সেনাপতি যুদ্ধের হুকুম দিয়া সৈনিক ও সেনাধ্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়া, নিশ্চিন্ত আলস্যে নিদ্রিত থাকে, সামরিক আইনে সে সব সেনাপতির শাস্তি হয়। ইহাদের শাস্তি দিবার কি কেহই নাই?

আমরা চাই শিক্ষার আমুল সংস্কার—যে-শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত সুশিক্ষা হয়, এবং যে-শিক্ষা তাঁহাদের উত্তরজীবনে কাজে লাগে। বৎসর বৎসর কয়েক হাজার করিয়া পাশ-করা তোতা পাখী আমরা চাই না।

ছেলেদের ও মেয়েদের উপযোগী, প্রকৃত শিক্ষামূলক নূতন পাঠ্য পুস্তকের প্রবর্ত্তন ও শিক্ষাদান প্রণালীর কল্যাণকর সহজ উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে! কেহই কি ভাবিয়া দেখেন না, একই শিক্ষা, একই প্রণালী ছেলেদের ও মেয়েদের কি করিয়া সমান উপযোগী হয়? পুরুষ ও নারীর স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে, এক শিক্ষা কি করিয়া তাহাদের জীবনে সুফলপ্রসূ হইতে পারে? বর্ত্তমান কালে এই উদাসীন উদ্দেশ্যহীন শিক্ষাদান প্রণালীর ফলে, ছেলেরা হইতেছে মেয়েলী, আর মেয়েরা হইয়া উঠিতেছে না-মেয়ে না-পুরুষ, একটা কিম্ভূতকিমাকার!

ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত অন্ততঃ মেয়েদের এমন শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, যাহা দ্বারা মেয়েরা সত্যই মেয়েলী হয় এবং মাতা ও গৃহিণীর উপযুক্ত হইয়া গড়িয়া উঠে। কাজেই, এ ভাবে ছাত্রীদিগকে গঠিত করিতে হইলে মেয়েদের জন্য চাই নূতন পাঠ্য ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রণালী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যদি দেশের প্রকৃত শিক্ষাদানে সত্যই উৎসুক থাকেন, তাহা হইলে অবিলম্বে তাঁহাদের ছাত্রীদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

উচ্চশিক্ষিতা বা অনুচ্চশিক্ষিতা উভয় শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যেই এখন ক্রমশঃ সংসারে ঔদাসীন্য ও আত্মসুখ এবং বিলাসপরতন্ত্রতা যে পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহার মূলে স্ত্রীধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের পরিপন্থী বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত শিক্ষাই দায়ী বলিয়া আমার বিশ্বাস।

ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত ছাত্রীদের ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্য, ভারতবর্ষের ইতিহাস, সামান্য ভূগোল, পাটীগণিত, রেখাঙ্কন, রচনা, অনুবাদ, সঙ্গীত, রন্ধন, সূচিশিল্প, প্রাথমিক ধাত্রীবিদ্যা, সন্তানপালন, গার্হস্থ্য-স্বাস্থ্য, ব্যায়াম, ধর্ম্ম প্রভৃতি নারীজনোচিত শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত মেয়েদের এইরূপ শিক্ষাই বাঞ্ছনীয়! ম্যাট্রিকের পর মেয়েরা যদি উচ্চতর শিক্ষা লইতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জন্য ছেলেদের সহিত একই পাঠ্য হয়ত চলিতে পারে। কিন্তু ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্তরূপ শিক্ষার যে নিতান্ত প্রয়োজন, তাহাতে বোধ হয় কাহারও কোনও মতদ্বৈধ নাই।

ছাত্রদের শিক্ষার পরিবর্ত্তনও একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যে সাধারণ জ্ঞান বর্ত্তমানে বড় কাহারও হইতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে কখনও কি কিছু চিন্তা করিয়াছেন।

শিক্ষার অপকর্ষ যে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কাহারও কিছু নাই। সুশিক্ষা হয় না বলিয়া ছেলেদের সৎশিক্ষার পরিচয়ও আজকাল পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে ছেলেদের ছিল ভক্তি সম্ভ্রম শ্রদ্ধা বিনয় সুব্যবহার অমায়িকতা প্রভৃতি বহু সদ্‌গুণ। আজকাল ছাত্রদের মধ্যে এ কয়টি গুণের বিশেষ অভাব লক্ষ্য করি বলিয়াই, বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অপকর্ষই জাতীয় জীবনে এই পরিস্থিতি ঘটাইয়াছে।

শিক্ষকে-ছাত্রে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ উঠিয়া গিয়া এখন হইয়াছে দাদা—ভাই বা দি—বোন্ অর্থাৎ বান্ধবতা। মেয়েরা বলে, অমুক-দি—ছেলেরা

বলে, অমুক-দা। ছেলে মেয়েদের প্রথম সম্ভ্রমজ্ঞান ভঙ্গ হয়, এই ব্যাপারে; তাহার পর, ক্রমশঃ ঠাট্টা, বিদ্রূপ, হাসি, রসিকতা প্রভৃতি ব্যাপারে ছেলে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষকদের সঙ্গে দাঁড়ায় একটা সখ্য — এমন কি ইয়ার্কির ভাব পর্য্যন্ত। অথচ কিছুদিন পূর্ব্বেও শিক্ষক বলিতে আমরা বুঝিতাম মূর্ত্তিমান্ গাম্ভীর্য্য, স্নেহশীলতা, চরিত্রবত্তা এবং পাণ্ডিত্য। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি এবং আজও সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করিতেছি, শিক্ষকগণ প্রত্যেক ছাত্রের সুশিক্ষার জন্য কি আন্তরিক যত্ন লইতেন। আজকাল, এ মনোভাব কোথাও নাই। হয়ত তাঁহাদের কেহ কেহ বেত্রাঘাতের জল্লাদও ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম।

বেত্রাঘাত বা অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা অবলম্বন না করিয়াও যে সুশিক্ষক হওয়া যায়, তাহার বহু পরিচয় আমরা পাইয়াছি, যাঁহাদের পবিত্র স্মৃতি এখনও আমাদের অন্তরলোকে সমুজ্জ্বল হইয়া আছে।

বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষায় নারী

ছাত্রীদের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন। ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত তাহাদের নূতন পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষণীয় বিষয়ের কি প্রকার সংস্কার করা উচিত সে সম্বন্ধে সাধারণ্ ভাবেই আলোচনা করিতে সাহসী হইতেছি। কারণ মেয়েদের শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক কতকগুলি ব্যাপারও জড়িত।

আমাদের দেশ ইয়ুরোপ বা আমেরিকা নয়। যে স্ত্রী-শিক্ষার এখন দ্রুত প্রসার বাড়িতেছে, তাহার সূত্রপাত হইয়াছে যদিও ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে, কিন্তু মেয়েদিগকে সত্য সত্য শিক্ষাদান উদ্দেশ্যে স্কুল কলেজে পাঠান আরম্ভ হইয়াছে মাত্র ২৫।৩০ বৎসর। কাজেই, এই ২৫।৩০ বৎসরে স্ত্রী-শিক্ষার যে ফল ফলিয়াছে, তাহার হিসাবনিকাশ করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয় যে, সম্প্রতি কতকগুলি মেয়ে ইংরাজী ও বাংলা

ভাষায় নাম সহি করিতে, খবরের কাগজ পড়িতে, ইংরাজীতে দুই চারিটি কথা বলিতে ও বুঝিতে, গালাগালি বা অনুচিত ভাষা প্রয়োগ করিলে মোটামুটি অর্থবোধ করিতে পারে এবং এই অসম্পূর্ণ শিক্ষায় হাজারখানেক মেয়ে শিক্ষকতা করিয়া বা ধাত্রী-বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়া যৎসামান্য কিছু উপার্জ্জনও করিতেছে। দুই চারিজন মেয়েকে অন্যান্য কার্য্যেও নিযুক্ত করা হইয়াছে শুনিয়াছি। ওকালতী ডাক্তারীও মেয়েরা করিতেছে। এখন এই যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখিয়া স্বাধীন ভাবে অর্থোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করিয়াছে, ইহা যেমন ভারতীয় নারীর আদর্শোচিত নহে, তেমনি এ প্রকার স্বাতন্ত্র্য নারীধর্ম্মোচিতও নয়। নারীর কর্ম্মক্ষেত্র বিবাহিত জীবনে, তাহার স্বামীপুত্র পরিবারকে লইয়া। মুখে এই সব স্বাধীনা(?)রা যাহাই বলুন্ না কেন, অন্তর্যামী জানেন এবং তাঁহারা নিজেরাও সবিশেষ অবগত আছেন যে, বাহিরের কঠিন হাটবাজারের ক্ষেত্রে তাঁহাদের যোগ্য স্থান মোটেই নাই এবং সেখানে তাঁহাদের অন্তরের সত্যকারের আকর্ষণও নাই। যে কোনও কারণে হউক, তাঁহারা স্বামী ও স্বামীর গৃহ পান নাই বলিয়াই, বাধ্য হইয়া তাঁহারা পূর্ব্বোক্তরূপ স্বাতন্ত্র্যব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। আঙুর ফল টক কি না, না খাইলে বলা শক্ত।

স্ত্রীলোক এ দেশেও যেমন, ইয়ুরোপ ও আমেরিকাতেও তেমনি। এ দেশে স্ত্রীলোকের বিবাহ যখন বাধ্যতামূলক ছিল, তখন এ সব স্বাধীনতা (?) ছিল স্বপ্ন; কিন্তু অর্থ নৈতিক দুর্দ্দশায় সামাজিক এবং ধর্ম্মের শৃঙ্খল ক্রমশঃ শ্লথ হইয়া পড়ায়, সমাজে যে একটা বিপ্লব ঘটিয়াছে এবং দিন দিন ঘটিতেছে, তাহার ফলে, আমাদের নৈতিকশক্তির অতি দ্রুত হানি ঘটিতেছে, যাহার দরুণ বিবাহ ব্যাপারটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে একটা বিলাস, কাজেই অবশ্য-কর্ত্তব্য ক্রিয়া রূপে আর গণ্য নয়। ছেলে ও মেয়েরা নূতনত্বের মোহে বহু প্রকার বুলি আওড়াইয়া ধরিয়া বসিল,

বিবাহ করিব না! অনেক পিতা অর্থাভাবে পুত্রকন্তার বিবাহ দিতে অক্ষম বলিয়া পারিতেছেন না, অনেক পুত্রকন্যাও মূঢ়তাবশে বিবাহ করিতে রাজী নয়।

ফল একই দাঁড়াইল, বিবাহযোগ্য বয়সে ছেলেমেয়ের বিবাহ হইতেছে না। মেয়েরা দুই পাতা ইংরাজী পড়িয়া ও অবরুদ্ধ জীবের হঠাৎ অবরোধ-মুক্তির মত এ-পাড়া ও-পাড়া ট্রামে-বাসে দুই চারি দিন চলাফেরা করিয়া বুঝিল যে, তাহারা নিজের ভার নিজে লইতে যখন সম্পূর্ণ সক্ষম, তখন কেন মিছে বাপ ভাই (স্বামী?) বা আত্মীয় স্বজনের গলগ্রহ হইয়া থাকিবে? সে নিজের ভার নিজে লইয়া স্বতন্ত্র হইবে, যেমন ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় বহু মেয়ে করিতেছে।

কিছুদিন পূর্ব্বেও যে-দেশের মেয়েরা বাপ-ভাইয়ের অন্নকে পাপান্ন বা কদন্ন মনে করে নাই, যে-দেশের মেয়েরা বিবাহ না করাটা মহাপাপ বলিয়া বিশ্বাস করিত, যে-দেশের মেয়েরা অবস্থাবৈগুণ্যে পিত্রালয়ে আসিয়া অগত্যা বাস করিত বটে, কিন্তু পিতামাতা যে তাহাদিগকে গলগ্রহ ভাবিত, এ প্রকার স্পর্দ্ধিত কল্পনা করিতেও কুণ্ঠিত হইত— আজ এই সামান্ত কয়টি বৎসরেই সেই দেশের, সেই সমাজের এবং সেই সমাজের পিতামাতাগণের মন কি এমনি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল? আমার মনে হয় এবং আমি বিশ্বাস করি যে, এ প্রকার পরিবর্ত্তন দূরে থাকুক, কোনও রকম কিছুই ঘটে নাই! বাপমায়ের তেমন পয়সা আর নাই বলিয়া, আগেকার মত অপব্যয় হয়ত করিতে পারেন না, অনেক কর্ত্তব্য কার্য্যও হয়ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন না—কিন্তু সে জন্ম তাঁহাদের মন বদলায় নাই, মন তেমনিই আছে। অর্থাভাবের দুঃখকষ্ট পিতামাতা যতটা ভোগ করেন, পুত্রকন্যা তাহার শতাংশের একাংশও করে না। কাজেই বর্ত্তমান সামাজিক এই কুপ্রথার মূলে আমাদের পণপ্রথা ও অর্থাভাব যতটা আছে (আগেও ইহা ছিল)

বর্ত্তমান শিক্ষার কুফলও ততটাই বিদ্যমান্। ছেলেমেয়েদের উৎকট কল্পনাই এই সমস্যাকে দিন দিন প্রবল হইতে এমন প্রবলতর এবং জটিলতর করিয়া তুলিতেছে।

ছেলেদের ও মেয়েদের শিক্ষা ও শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু এক হওয়ায়, মেয়েরা ভাবে, তাহারাও পুরুষদেরই সমান। অবশ্য এ ভাবা নিতান্ত অহেতুকও মনে হয় না। কিন্তু যে শিক্ষায় ছেলেরা সমস্ত সুযোগ ও সুবিধা সত্ত্বেও নিজেদের উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে না, সে শিক্ষায় মেয়েদের স্বাধীনভাবে জীবিকাঅর্জ্জনের সুবিধা কি করিয়া হইবে? ছাত্রীরা এইটি ভাবিয়া দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্যকল্পনা আকাশকুসুমচয়নের মতই বাতুলতা! অতি-বিলম্বে এক দিন তাঁহারা বুঝিবেনই চিরাচরিত অবশ্য কর্ত্তব্যে অবহেলার দুঃখ।

আমাদের দেশের তথাকথিত শিক্ষিত মেয়েরা ইয়ুরোপ ও আমেরিকার মেয়েদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, নিজেদের পায়ে নিজেরাই যে কুঠারাঘাত করিতেছেন, তাহা বুঝেন না। ও সব দেশে মেয়েদিগকে কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা অনেকেরই হয়ত নাই, কাজেই ভুল ধারণায় অনেকে ভুলই করিয়া বসে।

বৃটেনে স্ত্রীশিক্ষা

বৃটেনে পূর্ব্বেও ছিল, সম্প্রতি মেয়েদের শিক্ষায় আরও বহু নূতন বিষয়ের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষাকাল হইতেই ছাত্র-ছাত্রীদিগকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করিয়া গড়িবার এই প্রচেষ্টাকেই সত্যকার শিক্ষাদান বলে। প্রত্যেক ছাত্রীকেই ইঁহারা গৃহলক্ষ্মী করিয়া গড়িয়া তুলিয়া জাতির ভবিষ্যৎ-ভিত্তিকে কিরূপ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট, সেইদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। মেয়েদের শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকার কয়েকটি এই প্রসঙ্গে উপস্থাপিত করিতেছি। বলা বাহুল্য, এ প্রাথমিক শিক্ষা।

সঙ্গীত

শিশুদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়ার উপযোগিতা প্রত্যেক মনীষীই স্বীকার করেন। সঙ্গীতের দ্বারা তাহাদের শুধু মানসিক উৎকর্ষই সাধিত হয় না, দৈহিক স্বাস্থ্যও ভাল হয়। এইজন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ছাত্র-ছাত্রীদিগকে মাঝে মাঝে ভাল কনসার্টে লইয়া যাওয়া হয় এবং শিশুদের নিজেদের কনসার্টও মধ্যে মধ্যে সাধারণকে শুনান হয়।

গার্হস্থ্যবিদ্যা

প্রত্যেক মেয়েকে বিদ্যালয়ের অন্যান্য পাঠের সঙ্গে গৃহকর্ম্ম ও গৃহধর্ম্ম শিক্ষা করিতে বাধ্য করা হয়। কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন যে, মেয়েরা যত উচ্চ শিক্ষাই লাভ করুন্, তাঁহাদের প্রকৃত ও একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র গৃহ, কাজেই প্রত্যেক মেয়েকে গৃহরক্ষা গৃহপালন ও গৃহশাসন করিবার মত শিক্ষা দিয়া, প্রত্যেককে পাঠসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নিপুণা গৃহকর্ত্রী করিয়া ছাড়িয়া দেন। কাজেই মেয়েদের শক্তি ও বয়স অনুযায়ী তাঁহাদিগকে ক্রমে ক্রমে নিজের স্বাস্থ্যরক্ষা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, নারীদেহের আব্রু ও সৌন্দর্য্যরক্ষা, জুতাপরিস্কার, বিছানাপাতা, চুলের ব্রুশ ধোওয়া, গৃহস্থালীর জিনিষপত্র পরিস্কার করা, সোণা রূপা পিতল কাঠ ও অন্যান্য ধাতুনির্ম্মিত জিনিষ পরিস্কার রাখা, কাপড়চোপড় ধোওয়া ও ইস্তিরি করা, রুটি কাটা, চা ও খাবার তৈরি এবং রন্ধন প্রভৃতি শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা হইতেই লইতে হয়।

উচ্চশিক্ষাকালে মেয়েদিগকে দুধ, মাখম, ডিম, রুটি, ভাত, মাংস ও শাকসব্জী প্রভৃতি খাদ্যের গুণ এবং মানুষের স্বাস্থ্যগঠনে, শরীরের তাপরক্ষায়, শক্তিপ্রজননে ইহাদের উপযোগিতা এবং প্রাণশক্তিবৃদ্ধিতে খাদ্যের রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে বিশেষ ভাবে সুশিক্ষিত করা হয়। খাদ্যের গুণাগুণ যদি গৃহকর্ত্রী না জানেন, তাহা হইলে সে পরিবারে কাহারও স্বাস্থ্য কখনও ভাল থাকে না।

বাগান তৈরী

ছাত্র এবং ছাত্রী উভয়কেই বাগানের কাজে বাধ্য করা হয়। প্রত্যেককে নিজ হাতে গোড়া হইতে অর্থাৎ মাটি কাটা জল দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট ছোট একটি বাগান তৈরি করিতে হয়। এই বাগানের জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সহিত আধ একার করিয়া জমি আছে।

ইংরাজী ভাষা

গল্পের ভিতর দিয়া শিক্ষা যেমন সহজ সরস এবং দ্রুত হয়, তেমন কেবল বই পড়িয়া হয় না। সেজন্য শিক্ষকগণ মুখে মুখে কিছু গল্প শুনান, কিছু পড়িয়া শুনান এবং ছাত্রছাত্রীরা কিছু কিছু পড়ে। এই ভাবে গল্প শোনা ও বলার দ্বারাই ছাত্রদের ভাষা শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হয়।

ছাত্রছাত্রীদের লিখিবার শক্তি দ্রুত হওয়া চাই। আধ ঘণ্টায় অন্ততঃ পক্ষে ৩৫টি অক্ষর লেখা অভ্যাস করাইবার জন্য, হস্তলিখনেরও ক্লাস আছে।

কবিতা পড়াইবার সময় শিক্ষক যেন অকারণ ছন্দ বা বাকচাতুর্য্য লইয়া বৃথা সময় নষ্ট না করেন। কবিতা শোনামাত্র ছাত্রছাত্রীদের অন্তরে কবিতার যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ঝঙ্কার ও চিত্র ফুটিয়া উঠে, কবিতার যে সঙ্গীত শিশুর মনে আপনাআপনি রণিত হয়, কবিতার ছন্দে শিশুর অন্তরে যে দোলন জাগে—কবিত্বময় ও সঙ্গীতানুগ করিতে কবিতার সেই আবেগই যথেষ্ট, তাহার কচকচানি একেবারেই অনাবশ্যক।

বিভিন্ন প্রদেশে কথ্য ভাষার স্বাতন্ত্র্য এবং বলিবার একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী যে আছে, সেটি ইহারা নষ্ট হইতে দেন না। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রত্যেকেই নিজস্ব কথ্য ভাষার ভিতর দিয়া ভাষা শিক্ষা করিবে। ছাত্রছাত্রীদের পারিবারিক ও উত্তরজীবনে নিজস্ব কথ্য রীতির বিশেষ প্রয়োজন আছে।

প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী যেন স্পষ্ট ও পরিস্কার করিয়া কথা বলে এবং পড়ে। অস্পষ্ট ও অর্দ্ধোচ্চারিত কথা বলার কদভ্যাসে তাহাদের জিহ্বার জড়তা ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়।

ইতিহাস

আর্কিমিডিস্, সীজার, ড্রেক, র‍্যালে, উল্‌ফ্, মণ্টকাম, আল্‌ফ্রেড, প্রথম এড্‌ওয়ার্ড, চ্যাথাম, ক্লাইভ, ব্লেক, নেল্‌সন্‌ হার্ভি, লিষ্টার, পাস্তুর প্রভৃতির জীবনচরিতে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রচুর উপকরণ বর্ত্তমান। এই সব লোকপ্রসিদ্ধ চরিত্রের সদ্‌গুণাবলী গল্পচ্ছলে পড়াইলে, ছাত্রদের নৈতিক জীবনে বাল্যকাল হইতেই একটা মহত্ত্বের বীজ রোপিত করিয়া দেওয়া হয়। অথচ ইতিহাস পড়াইতেছি বলিয়া কেহ যেন তাঁহাদের দুর্নীতি বা কুশিক্ষার প্রসঙ্গগুলি না পড়ান্ : যেমন, অষ্টম হেনরীর স্ত্রীত্যাগ, দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে রাজ্যবিপ্লব, অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি। সৎশিক্ষা দানই বিদ্যালয়ের যখন উদ্দেশ্য, তখন সৎশিক্ষামূলক শিক্ষাই বিদ্যালয় দিবে।

ভূগোল

ভূগোল পড়াইতেও গল্পের প্রয়োজন। দেশের ও স্থানের নাম মুখস্থ করাইয়া ছাত্রদিগকে বিব্রত করায় যথেষ্ট কুফল আছে। এ জন্য প্রত্যেক দেশের নাম পড়াইবার সময় সেই সব দেশের ঐতিহাসিক বা কিম্বদন্তিমূলক গল্প বলিয়া শিক্ষার্থীদের মনে প্রত্যেক দেশের এক একটা স্থায়ী ছবি আঁকিয়া দেওয়া হয়। উক্ত গল্পে সেই সব দেশের একটা সাধারণ পরিচয় থাকা চাই। ভূগোল এভাবে পড়াইলে ছাত্রেরা জীবনে কখনও ভূগোল ভুলিবে না।

অঙ্ক

দশমিক বা ভগ্নাংশের প্রয়োজনীয়তা সাধারণ মানুষের খুবই কম। কাজেই খুব বড় বড় দশমিক বা ভগ্নাংশের অঙ্ক একেবারেই নিরর্থক।

ছাত্রছাত্রীরা মোটামুটি জিনিষটা বুঝিতে পারিলেই হইল। কাজেই প্রাথমিক জ্ঞানলাভের জন্য যতটা প্রয়োজন, ততটুকু শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট।

যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের সম্বন্ধেও ঐ কথাই। গুণ ভাগ ১২টি অঙ্কের বেশী না দেওয়াই ভাল।

বড় বড় অঙ্ক কষাইয়া ছাত্রছাত্রীদিগকে অকারণ গলদঘর্ম্ম না করাইয়া, তাহাদিগকে গণিতের প্রত্যেক শিক্ষণীয় বিভাগে ছোট ছোট অঙ্ক কষাইয়া নিপুণ করিয়া তোলাই ঢের বেশী সঙ্গত। ছোট ছোট অঙ্কের সংখ্যা যত বেশী হইবে, ছাত্রছাত্রীরা তত বেশী অভ্যস্ত হইবে। অতি-কষ্টে একটা বড় অঙ্ক কষিয়া, ছাত্রছাত্রীরা ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে ১০টা ছোট ছোট অঙ্ক কষিতে তাহারা ক্লান্ত হওয়া দূরে থাকুক, আনন্দই পায়।

বৃটেনে সম্প্রতি নূতন যে শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহার কিছু পরিচয় এই। ইহার সহিত আমাদের বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালীর যে বিরোধ কোথায়, আমাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন।

সে সব মেয়েরা বিবিয়ানা ও স্বাধীনতাপন্থী তাঁহারা উপরের শিক্ষা-প্রণালীতে বুঝিতে পারিবেন যে, বৃটিশ জাতি মেয়েদিগকে গৃহিণীরূপেই তৈরি করিতে চায়, বিবি করিতে চায় না। সেখানকার মেয়েরা সাধারণতঃ গৃহিণী, বিলাসিনী নয়!

আমাদের মেয়েরা ইয়ুরোপীয় মহিলাদের বিবিরূপই দেখেন, কিন্তু তাঁহাদের গৃহিণীপনা দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, ইয়ুরোপীয় ও ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে কি অপরিমেয় ব্যবধান।

জার্ম্মাণীতে স্ত্রীশিক্ষা

জার্ম্মাণী মেয়েদের জন্য নূতন শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়াই ক্ষান্ত বা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নাই, জার্ম্মান্ সাম্রাজ্যান্তর্গত উপনিবেশগুলিকে

সম্পূর্ণরূপে জার্ম্মান করিয়া তুলিতে, সেখানকার রাষ্ট্রপতি যে কল্পনা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। আর, এ কল্পনা এখন আর কল্পনা নাই, রীতিমত কার্য্যেও পরিণত হইয়াছে এবং সে কার্য্য বহুদূর অগ্রসরও হইয়াছে।

বার্লিন হইতে কিছু দূরে, রেণ্ডস্‌বার্গ-এর খালের অপর দিকে, বহু সহস্র বালিকা ও যুবতীকে ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে একটি বিরাট শিক্ষালয় তৈরী হইয়াছে। এই স্ত্রীশিক্ষানিকেতনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য, ছাত্রীদিগকে সাধারণ মানবীয় যোগ্যতায় শিক্ষাদান ও পারদর্শীকরণ।

এমন সময় আসিতে পারে, যখন কতকগুলি জার্ম্মান্ মেয়ের জার্ম্মানীর উপনিবেশে কিম্বা জার্ম্মান সাম্রাজ্যের বাহিরেও জার্ম্মানীর প্রতিনিধিরূপে যাইবার প্রয়োজন হইতে পারে; এরূপ প্রয়োজন না হউক, অন্য বহু কারণেও জার্ম্মান মেয়ের জার্ম্মানীর বাহিরে গিয়া বসবাস করিবার দরকার হইতে পারে, কিম্বা তাহাও যদি না হয়, কতকগুলি এমন শিক্ষিত মেয়ে জার্ম্মানীতে থাকা চাই, যাহারা যে কোনও প্রয়োজনে দেশের বাহিরে গিয়া স্বদেশের নামের অমর্য্যাদা যেন না করে। দেশের বাহিরে, বিদেশে, তাহারা যেন কোনও অভাব অসুবিধা প্রলোভন বা দুঃখ কষ্টে ভাঙিয়া না পড়ে এবং তজ্জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া জার্ম্মানীর মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ না করে। স্বাবলম্বী আত্ম-নির্ভরশীল নির্ভীক নারী তৈরিই এই Colonial School For Womenএর উদ্দেশ্য।

এই বিদ্যায়তনে মেয়েদিগকে গৃহের, বাগানের, বাড়ীঘরের, আস্তাবলের, ছোটখাট কামারশালের, ইঞ্জিনিয়ারিং, বিদ্যুতের এবং অন্যান্য সমস্ত কাজ নিজের হাতে শিখিতে হয়। ছাত্রী ও শিক্ষকগণ সকলেই এমন ভাবে এক সঙ্গে কাজ করেন যে মনেই হয় না, কে শিক্ষক কে ছাত্রী।

শিক্ষকগণের বিদেশের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা থাকায়, তাঁহারা ভালই জানেন, বিদেশে কি চাই। ছাত্রীরাও কায়মনোবাক্যে এই অ-নারী-সুলভ শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এখানকার ছাত্রীরা যে বিদেশের সুমধুর কল্পনায় প্রলুব্ধ হইয়া এই কষ্ট-সাধ্য-শিক্ষায় কখনও ব্রতী হইয়াছে, তাহা মনে হয় না।

ছাত্রীদিগকে সর্ব্বাগ্রে তৎপরতা ও আত্মসংযম শিক্ষা দেওয়া হয়। তৎপরতা ও আত্মসংযমের সহিত সততা, সাহস, ব্যায়াম, কার্য্যপ্রবৃত্তি ও কর্ম্মস্বাধীনতা এবং নারীধর্ম্মোচিত অন্যান্য শিক্ষারও রীতিমত ব্যবস্থা আছে।

ছাত্রীরা এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ২০ জন ছাত্রী লইয়া এক একটি সঙ্ঘ অর্থাৎ এক একটি পরিবার। এই পরিবারস্থ প্রত্যেকে কার্য্য করিবে, কিন্তু কে যে কি করিবে, তাহা কাহাকেও বলা হয় না। নিজ নিজ ইচ্ছামত প্রয়োজনবোধে সকলকেই কার্য্য করিতে হয়। অথচ কেহই কাহাকেও সাহায্য করে না, বা 'এটা আমি করিব,' 'ওটা আমি করিব না' বলিয়া বায়নাও ধরে না। এই যে ২০ জনের পরিবার, ইহার মধ্যে আবার শিক্ষকের নির্দ্দেশমত, বিনা সংবাদে প্রাতরাশ বা নৈশাহারে অন্য সঙ্ঘের ছাত্রীদিগকে অতিথিরূপে হাজির করা হয়। তখন অতিথির যথাযথ সৎকার করিতে হয়।

ছাত্রীরা সকাল ৫টায় উঠিয়া, কেহ চা ও খাবার তৈরি করিবে, কেহ কাপড়চোপড় কাচিবে, কেহ রান্না করিবে, কেহ দুগ্ধদোহন করিবে কেহ বাগান হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনিবে, কেহ ঘরদুয়ার পরিষ্কার করিবে, কেহ বাগান তৈরি করিবে, কেহ ভাঙা তৈজসপত্র মেরামৎ করিবে, কেহ জুতা ব্রুশ করিবে প্রভৃতি যাবতীয় সাংসারিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া, যথাসময়ে আহারাদি সারিয়া দ্বিপ্রহরে সেলাই ও অন্যান্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। প্রত্যেক কার্য্যেরই একটা নির্দ্দিষ্ট সময়

আছে, পরিদর্শকগণ শুধু লক্ষ্য রাখিবেন, সব কাজ সুশৃঙ্খলায় যথাসময়ে সুসম্পন্ন হইতেছে কি না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই বিদ্যালয় একটি পরিবার। এখানে কখন্ যে কাহাকে কি করিতে হইবে, কেহই তাহা জানে না। কেহই কাহাকে কিছু করিতে বলিবে না, বারণও করিবে না, সাহায্যও করিবে না—অথচ কোনও কার্য্য পড়িয়াও থাকিবে না।

দুগ্ধদোহন, পনীর তৈরি, ফুটোফাটা তৈজসপত্রাদি মেরামৎ করা প্রভৃতি কার্য্যও ছাত্রীদিগকে করিতে হইবে। এখানে দাসদাসীর বালাই নাই। ঘরের দুয়ার জানালায় রং দেওয়া, চুণকাম ও বালির কাজ এবং সময় সময় রাজমিস্ত্রী কামার চামার দর্জ্জির কাজ পর্য্যন্ত ছাত্রী-দিগকে করিতে হয়।

ড্রেণ পরিষ্কার, ভিস্তির কাজ, পথের আলো জ্বালা ও নেবান, চাষ, ঘোড়ার পরিচর্য্যা প্রভৃতি কার্য্যও ছাত্রীদের কর্ত্তব্য। অবসরকালে ঘোড়ায় চড়া, নৌকা চালনা, গাড়ী চালনা, মাটি কোপান প্রভৃতি কার্য্য করিতেও মেয়েদের আগ্রহ খুব বেশী।

প্রত্যেক পরিবারে জমাখরচ এবং দৈনিক কি কি কাজ হয়, তাহারও একটা হিসাব রাখিতে হয়।

বন্দুক চালনা, মুষ্টিযুদ্ধ ও দৈহিক শক্তিসঞ্চয়ের নানা প্রকার ব্যায়ামও ছাত্রীদিগকে প্রত্যহ করিতে হয়।

এ সকল ছাড়া এখানে মেয়েদিগের ফরাশী ইংরাজী বা স্প্যানিশ ভাষা শিক্ষারও সুব্যবস্থা আছে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসহ বিশাল ল্যাবরেটরী আছে, সেখানে বিজ্ঞানও পড়িতে হয়।

দেশের ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্বন্ধে এই শিক্ষালয়ে ছাত্রীদিগকে বিশেষ-রূপে শিক্ষিত করা কর্ত্তৃপক্ষের অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্যান্য দেশের ব্যবসা

বাণিজ্য এবং খণিজ ভূমিজ দ্রব্যাদির সম্বন্ধেও মেয়েদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

মাত্র তিন চারি বৎসর এই বিদ্যালয় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে ইহার ছাত্রীসংখ্যা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, বিদ্যালয়ের আয়তন এবং এই স্থানটি আরও বিস্তৃত না করিলে আর চলিবে না।

এই শিক্ষায়তনের উপনিবেশে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। এখানে প্রবেশ করিতে হইলে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে ছাড়পত্রের প্রয়োজন।

আমাদের দেশের কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদের মেয়েদের জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি?

শিক্ষা কাহাকে বলে, তাহার কতকটা আভাষ আমাদের মেয়েরাও ইহা হইতে পাইতে পারেন। *

এদেশীয় বালিকা ও নারীদের শিক্ষা

বর্ত্তমানে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই বালিকাদিগের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে; তবে শহরের মেয়েদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা যে পরিমাণে প্রসার লাভ করিয়াছে, পল্লীর বালিকাগণের মধ্যে ততটা হয় নাই। মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতি বিশেষ করিয়া উচ্চতর শিক্ষায় খুবই আশাপ্রদ। বর্ত্তমানে মহিলাদিগের আর্ট কলেজ ও ব্যবসায়-সম্পর্কিত কলেজ ৪টি, ২৫টি উচ্চ ইংরাজী স্কুল ও ৪১টি মধ্য ইংরাজী স্কুল বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ছাড়া ১৫টি বিশেষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও আছে। বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয়ে বালিকাদের সংখ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৃদ্ধির পরিমাণ কলেজে ও উচ্চ বিদ্যালয়েই যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। প্রাইমারী অর্থাৎ প্রাথমিক স্কুলসমূহে বৃদ্ধির হার কিন্তু সেরূপ নয়।

* ১৯৩৭। ২২শে জুলাই এই নিবন্ধটি দীপালীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

মেয়েদের শিক্ষার অন্তরায়ের মধ্যে একটি হইল, লোকের স্বভাবসিদ্ধ রক্ষণশীলতা। কিন্তু অতীতে মেয়েদের শিক্ষার বিরুদ্ধে যে সংস্কার ছিল, তাহার অধিকাংশই ছিল শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে। বিদ্যালয়ে ধর্ম্মসম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা না থাকায়, মুসলমান অভিভাবকগণ বালিকা-গণকে স্কুলে পাঠান নাই। ইহা ছাড়া, মুসলমান সমাজের কঠোর পর্দা প্রথাও মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার একটা প্রধান অন্তরায়। হিন্দুদের মধ্যে অবরোধ তত কঠোর নয়, তাই মুসলমান মেয়ে অপেক্ষা স্কুলগামিনী হিন্দু মেয়ের সংখ্যা অনেক বেশী।

মেয়েদের শিক্ষার পথে বাল্যবিবাহও আর একটি অন্তরায়। সারদা আইন পাশ হওয়ার ফলে বাল্যবিবাহ বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। তাহার ফলে আজ আরও অধিক সংখ্যক বালিকা স্কুলে প্রেরিত হইতেছে।

বঙ্গদেশে সমস্ত স্ত্রী-শিক্ষার অগ্রগতি যদৃচ্ছাক্রমে চলিয়াছে। অনেক সময় অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করিয়া, অদূরদর্শী পরিকল্পনামতে শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; মেয়েদের জন্য যে সব স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা কেবলমাত্র ছেলেদের সাধারণ স্কুলের প্রতিরূপই নহে, বরং অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি হইতে অনেক হীন পর্য্যায়ের। বাঙলা গভর্ণমেণ্ট কিছুদিন পূর্ব্বে শিক্ষা বিষয়ে মহিলাদের একটি "পরামর্শ বোর্ড" স্থাপনের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। উহা প্রতিষ্ঠিত করা প্রকৃত উন্নতির পথে প্রয়োজনীয় চেষ্টা বলিয়াই মনে হয়। এতদিন পরে ঐ বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে যাবতীয় ব্যাপারে পরামর্শ দানের জন্য গবর্ণমেণ্ট এই কমিটী গঠন করিয়াছেন এবং এই কমিটীর যাবতীয় সুপারিশ গভর্ণমেণ্ট বিশেষ মনোযোগের সহিত বিবেচনা করিবেন, বলিয়া আশা দিয়াছেন।

ঢাকা সার্কেলের স্কুল সমূহের ভূতপূর্ব্ব ইনস্পেক্ট্রেস মিস্ পিকক্ তাঁহার

রিপোর্টে লিখিয়াছেন—"একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রাথমিক শিক্ষার স্থায়ী উন্নতির সমস্যা পূরণ করিতে হইলে সার্ব্বজনীন শিক্ষার উন্নততর পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। কেবলমাত্র এই দৃঢ় ভিত্তির উপরই কোন দেশের শিক্ষোন্নতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। বর্ত্তমানে বাঙলাদেশে বালিকাদের উচ্চ-বিদ্যালয়গুলি, হীন পর্য্যায়ে পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষার নির্ভর-অযোগ্য ভিত্তির উপর, আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। কাজেই ঐ স্কুলগুলির কাজ অত্যন্ত নিরুৎসাহে ও অর্থহীন গতানুগতিকভাবে চলিয়াছে এবং পরীক্ষা পাশ করাই ইহার একমাত্র কামনার বস্তু হইয়াছে।"

১৯৩৬-৩৭ সনে বাঙলাদেশে বালিকাদের প্রাইমারী স্কুলের মোট সংখ্যা ছিল ১৭, ৩৯৬, ইহার মধ্যে মাত্র ৯৭৯টি ছিল উচ্চ প্রাইমারী স্কুল ; অর্থাৎ মাত্র এই কয়টি স্কুলেই প্রাইমারী পর্য্যায়ের পূর্ণ শিক্ষা দান করা হইত।

মেয়েদের স্কুলের পাঠ্যতালিকা ও ছেলেদের স্কুলের পাঠ্যতালিকা একই। মেয়েদের তালিকায় কেবলমাত্র সেলাইএর কাজ ও গৃহস্থালীর সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু যেহেতু দুই-তৃতীয়াংশ বালিকাবিদ্যালয়ে স্ত্রীলোক-শিক্ষকের অভাব, সেজন্য ঐ সব বিষয়ে কোন শিক্ষাই দেওয়া হয় না। গ্রাম্য স্কুল বে-সরকারী লোকের দ্বারা পরিচালিত ; মাত্র ২৪টি স্কুল গভর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ পরিচালনাধীন এবং ৩০৫টি স্কুল জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক পরিচালিত, ১৩, ৪৭১টি স্কুল স্থানীয় প্রতিষ্ঠান অথবা গভর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য পায়। কেবলমাত্র পাদরী সম্প্রদায়ের কর্ত্তৃত্বাধীনের স্কুলগুলিই দক্ষতাসহকারে পরিচালিত হইতেছে। এই সমস্ত স্কুলে মৌলিক বিষয়সমূহ আধুনিক কৌশলে দক্ষতার সহিত শিক্ষা দিয়া শিক্ষাপদ্ধতিকে শিশুদের নিকট আনন্দদায়ক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয়। এই কারণেই

অনেক অভিভাবক তাঁহাদের ছেলেদিগকেও এই সব মেয়েদের স্কুলে পাঠানই শ্রেয়ঃ মনে করেন।

স্কুলগুলির উন্নতিবিধানে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া চেষ্টা না করিলে পল্লী-অঞ্চলে বালিকাদের শিক্ষার বিশেষ উন্নতির আশা নাই বলিলেও চলে। বর্ত্তমান সময়ে সবচেয়ে প্রয়োজন হইল অধিক সংখ্যক সুশিক্ষিতা ও পারদর্শিণী শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে যে-বেতন সাধারণতঃ শিক্ষাবিভাগ শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রীদিগকে দেন তাহাতে সত্যকারের কোনও শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী পাওয়া অসম্ভব। অথচ শিক্ষা বিভাগে মোটা বেতনের অনাবশ্যক উচ্চ কর্ম্মচারীর অভাব নাই।

১৯৩৭ সালের শেষ ভাগে ৬০টি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ছিল। ১৯৩১-৩২ সালে ঐরূপ স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩৬। ইহাদের মধ্যে ৬টি স্কুল গভর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে—২টি কলিকাতায় ও ৪টি পূর্ব্ববঙ্গে।

যদিও বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে সহশিক্ষা অনুমোদন করেন না, তথাপি বালকদিগের উচ্চ-বিদ্যালয়ে বালিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৩১-৩২ সনে বালকদের স্কুলে ১, ৫২৪ জন বালিকা শিক্ষা লাভ করিত, ১৯৩৬-৩৭ সনে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৪,০৮৩ জন হইয়াছে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, পিতামাতা হয় সহশিক্ষাকে দিন দিন বেশী পছন্দ করিতেছেন, নয় ত অগত্যা ছেলেদের স্কুলে মেয়েদিগকে পাঠাইতে বাধ্য হইতেছেন। বাংলাদেশের স্কুলসমূহে বালিকাদিগের জন্য স্বাস্থ্যরক্ষা-বিষয়ক সন্তোষজনক কোন ব্যবস্থা নাই। এ অবস্থায় উচ্চ-বিদ্যালয়ে সহশিক্ষার প্রচার সমর্থনযোগ্য নহে।

বালিকাদের উচ্চ-বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করা। ১৯২১-২২ সনে মাত্র ১০২ জন বালিকা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছিল। দশ বৎসরের পর ১৯৩১-৩২ সনে ম্যাট্রিকুলেশনে

উত্তীর্ণা বালিকাদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩৯৪। কিন্তু গত পাঁচ বৎসরে সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বাড়িয়াছে এবং ১৯৩৬-৩৭ সনে ১,০৪৯টি মেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছে।

একথা সত্য যে অন্যান্য দেশের মত বাঙলাদেশেও বালিকাদের সাধারণতঃ জীবনের লক্ষ্য হইল বিবাহ। কিন্তু কতকগুলি বালিকার বিবাহসম্ভাবনা অনিশ্চিত, বিশেষ করিয়া হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যে। কাজেই তাহাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত ভবিষ্যতে রোগীর সেবা, চিকিৎসার কার্য্য কিম্বা ঐরূপ কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবে, কিন্তু সাধারণতঃ তাহারা স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কাজ পাইতেই বেশী উৎসুক। যে সমস্ত বৃত্তি মেয়েরা অবলম্বন করিতে পারে, তাহার মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষা বিশেষ মূল্যবান, কিন্তু বাঙ্গলাদেশে বালিকাদের শিক্ষাগারে যথাযথ যন্ত্রাদিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার নাই। যত সত্বর সম্ভব বালিকাদের স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ ও সুবিধার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ইহাও প্রয়োজন যে শিক্ষকদের জন্য ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং স্কুলে যে প্রকারের ব্যবসায়-সম্বন্ধীয় শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, ঐ প্রকারের নাতিদীর্ঘ শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়া দেশে প্রস্তুত সাধারণ যন্ত্রাদির সাহায্যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে মেয়েদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। প্রকৃতপক্ষে বালিকা-বিদ্যালয়গুলিকে বালিকাদের হিতজনক করিতে হইলে, আরো নানা প্রকারের উন্নতি আবশ্যক। অধিকাংশ বালিকা-বিদ্যালয়েই স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু সে শিক্ষার সহিত বাস্তবতার সম্পর্ক অতি অল্পই। স্কুল পরিদর্শনে যে সমুদয় মহিলা নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা যদি স্কুলের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও অধিকতর পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতার জন্য তাগিদ করিতেন, তাহা হইলে স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা কিছুটাও সম্ভবপর হইতে পারিত। উদ্যান রচনা ও শাকশব্জীর চাষ বালিকাদের স্কুলে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বন্ধে ধারণা জন্মাইবার জন্য বালিকা বিদ্যালয়ে রন্ধন, সেলাইয়ের কাজ এবং গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজ সম্বন্ধে শিক্ষাও বাধ্যতামূলক করা দরকার।

প্রেসিডেন্সী বিভাগের ইন্স্পেক্ট্রেস বলেন যে, উচ্চতর শিক্ষার চাহিদা অত্যন্ত বেশী হইয়াছে এবং বালিকাদিগকে উচ্চতর শিক্ষা দেওয়ার জন্য অনেকে বড় বড় দানও করিতেছেন।

১৯৩৬-৩৭ সনে ৩৮২ জন বালিকা ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে, ২০৮ জন বালিকা বি-এ পরীক্ষা ও ১৮ জন এম-এ পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে।

১৯৩১-৩২ সনে উপরোক্ত পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণা ছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ১৪৩, ৮৮ ও ১০ ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে মেয়েরা কেবল উপাধি পরীক্ষার জন্যই যেন অধ্যয়ন করিতেছে।

"কি বিচিত্র এই বঙ্গদেশ"!

পৃথিবীর সর্ব্বদেশে আপামরসাধারণ লেখাপড়া শিখে জ্ঞানলাভ করিতে, নিজের পরিবারের সমাজের জাতির জন্য, দেশের উন্নতি ও উপকারের জন্য—আর আমরা লেখাপড়া (?) শিখি আমাদের আমূল অবনতি অধোগতি ও দুর্দ্দশার জন্য! হয়ত বা, লেখাপড়া শিখিয়া নয়, লেখাপড়ার গরমে বা বদ্‌হজমের দোষেও আমরা কষ্ট পাই। সত্য কথা বলিতে কি, শিক্ষা আমাদের হয় না, হয় শিক্ষার অভিমান, যাহা কুশিক্ষারই নামান্তর।

বাংলায় বর্ত্তমানে এই যে বাঙালীর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ঘটিয়াছে, ইহারও মূলে ঐ কুশিক্ষাই। অথচ উক্ত শিক্ষা, সু হউক বা কু হউক, আমাদিগকে এমনি পাইয়া বসিয়াছে যে, আমরা মধ্যবিত্ত গরীব গৃহস্থ পিতা-মাতাগণ বহু কষ্ট সহ্য করিয়া, এমন কি সর্ব্বস্ব পণ করিয়াও, পুত্র-

কন্যাগণকে ঐ শিক্ষা দিতেই লালায়িত হইয়া উঠিয়াছি। কারণ ইহা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলিতেও এই শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে, কিন্তু এক বাঙ্গালী ছাড়া আর কেহই এমন কুশিক্ষিত হয় নাই। বাঙ্গালী লেখাপড়া শিখিয়া হইয়া পড়িয়াছে নিতান্ত পরনির্ভর, দরিদ্র, পরশ্রীকাতর বিলাসী, দুর্ব্বল, শক্তিহীন, অনুকরণপ্রিয়, নির্ব্বীর্য্য, শ্রদ্ধাহীন, ধর্ম্মহীন, এবং অসংযমী যাহা অন্যান্য প্রদেশীয়গণ এখনও এতটা হয় নাই বা অদূর ভবিষ্যতে যে তাহারা আমাদের মত এমনি হইবে, এমনও মনে হয় না। "মাতৃজঙ্ঘা হি বৎসস্য স্তম্ভীভবতি বন্ধনে" এ প্রবচনের সমুজ্জল নিদর্শন বাঙ্গালী।

বাঙালী দুই পাতা ইংরাজী পড়িয়াই অমনি হইয়া উঠে ফিরিঙ্গী, শ্রমবিমুখ এবং আলস্যপরতন্ত্র। সে চায় জগতের সব সমৃদ্ধি ও সমারোহ তাহাকে আসিয়া বরণ করুক, সে পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া কেবল সম্ভোগ করিতে থাকিবে। বাল্যকাল হইতে এই কল্পনা পোষণ করিয়া উত্তর জীবনে সে হইয়া পড়ে সম্পূর্ণ শ্রমবিমুখ ক্লীব। কাজেই, তখন কোনও আয়াসসাধ্য কার্য্য আর তাহার মনেও যেমন লাগে না, দেহ-শক্তিতেও তেমনি কুলায় না। ফলে ২০।২৫ টাকা বেতনের কেরাণী-গিরিই হইয়া পড়ে তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। বাঙালী মধ্যবিত্তগণ হঠাৎ বিপন্ন হইয়া পড়িলে ভিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হয় না, কিন্তু কোনও কার্য্য করিতে বলিলেই তাহার অভিমান আহত হয় এবং নানা প্রকার শারীরিক সামাজিক বা পারিবারিক অজুহাত দেখাইতে থাকে। শ্রমকে যে জাতি এত হেয় ও অবজ্ঞেয় ভাবে, তাহাদের ঘরে কখনও লক্ষ্মীর কৃপা সম্ভব নয়, কারণ শ্রমের সিংহাসনেই লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান সর্ব্ব দেশে এবং সর্ব্বকালে।

অন্যান্য প্রদেশে যথাসাধ্য শিক্ষালাভ করিয়া লোকে প্রথমে কোনও

ব্যবসায়ে তাহার কর্ম্মশক্তিকে নিযুক্ত করিতে উদ্বুদ্ধ হয়, যদ্বারা সে নিজে সপরিবারে সুখে থাকিয়া আরও দশজনকে প্রতিপালন করিতে পারে। এই হয় তাহার উদ্দেশ্য—আর বাংলায় বাঙালী তাহার পৈতৃক ব্যবসা অথবা সুকর সহজসাধ্য কোনও স্বাধীন উপায়কে অবজ্ঞার সহিত পরিত্যাগ করিয়া ছুটে চাকরীরূপ মায়ামৃগের সন্ধানে। এই চাকুরী-প্রিয়তার মূলে আছে বাঙালীর শ্রমবিমুখতা, বিলাসপ্রিয়তা এবং দৈহিক ও মানসিক ক্লৈব্য।

ভদ্র বা বড় ঘরের ছোঁয়াচ সাধারণের মধ্যেও সংক্রামিত হয়, কাজেই বাঙালী বড়ঘরের এই পাপ আমাদের সমাজের নিম্ন স্তরে পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া বাঙালী জাতির ভিত্তিকে পর্য্যন্ত আজ ক্ষয়িষ্ণু করিয়া ফেলিয়াছে, যাহার জন্য বাংলায় আজ কোনও শ্রমসাধ্য কার্য্য করিবার জন্য বাঙালীকে আর পাওয়া যায় না। চাষা, ধোপা, মুচি, পাচক, ভৃত্য, মিস্ত্রী প্রভৃতির ছেলেরা পাঠশালে পড়িয়া এবং ২।১ ক্লাস ইংরাজী পড়িয়াই সে গ্রাম ছাড়িয়া ছুটে শহরে একটি কেরাণীগিরির জন্য—সে না পায় তাহার জীবনের পরম কাম্য ধন কেরাণী-পদ, না করিতে পারে তাহার পৈতৃক ব্যবসা—সে হইয়া দাঁড়ায় "ধোবী কা কুত্তা—না ঘাটকা না ঘর্‌কা" —এক অপরূপ জীব। অথচ যে ব্যবসা একচেটিয়া ভাবে তাহাদের বংশপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে, সে ব্যবসার উন্নতি বা পুষ্টি করার দিকে মনোযোগ না দিয়া সে তাহাকে পরিত্যাগ করে, কাজেই দেশান্তর হইতে নূতন লোক আসিয়া তাহা গ্রহণ করে। এমনি করিয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সব ব্যবসাগুলিই লোকে স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিয়া, অনিশ্চিত চাকুরীর বাজারে অযোগ্য উমেদারের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়াইয়া, বেকার-সমস্যাকে দিন দিন যেমন জটিলতর করিয়া তুলিতেছে, তেমনি তাহাদের পরিত্যক্ত নিশ্চিত ব্যবসাটিকেও অন্য লোকের হাতে তুলিয়া দিতেছে। নিশ্চিতকে পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতের পশ্চাদনুসরণের সুনিশ্চিত

কুফল তাই আজ বাংলার সমস্ত বিভাগে এমন কায়েমী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া, জগদ্দল পাথরের মত জাতির বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কলিকাতার মাড়োয়ারী সমাজ আমাদের মত লেখাপড়া (?) হয়ত তেমন শিখেন নাই, কিন্তু শিক্ষিত বাঙালী বাবুদের অপেক্ষা তাঁহাদের মানসম্ভ্রম ইজ্জৎ ও সম্পদ কি কম? যে সব মাড়োয়ারী ছেলে ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়াছে, তাহারাও ত কৈ বাঙালীদের মত চাকুরীর উমেদার হইয়া ফিরিতেছে না! তাহারা লেখাপড়া শিখিয়া নিজ নিজ ব্যবসায়েরই উন্নতিসাধন করিতেছে। তাহারা লোককে চাকুরী দেয়, চাকুরী করে না। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও বিলাসের মোহ বাঙালার মত ইহাদের অন্তরে এবং অন্দরে প্রবেশ করে নাই-বলিয়াই আজও তাহারা লক্ষ্মীর বরপুত্ররূপে এই মহানগরী কলিকাতা তথা সমগ্র বঙ্গের ব্যবসা ও বাণিজ্যের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা হইয়া বিরাজ করিতেছে।

আমরা সামান্য একটা কিছু করিতে গেলেই, প্রথমেই ভাবি, চেয়ার, টেবিল, টেলিফোন, বিজলী বাতি, পাখা, দারোয়ান, সাইন্‌বোর্ড এবং ইংরাজী পোষাক, তথ্‌মা বিজ্ঞাপন প্রভৃতি বহু আপাত-অবান্তর জিনিষ। আর বড়বাজারে ছোট একখানি ঘরে একজন মাড়োয়ারী প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার করিতেছে এমন ভাবে যে, তাহা দেখিলে আমাদের বাবুসাহেবরা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া অবজ্ঞাভরে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া, তৎক্ষণাৎ চলিয়াই যাইবেন।

কলিকাতায় কুলিগিরি করিয়া অবাঙ্গালীরা প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করিতেছে, অথচ সাধারণ বাঙালী অন্নাভাবে মারা যাইতেছে। পাঁচ হাজারের উপর রিকশা চলিতেছে, রিকশা চালক সকলেই অবাঙালী, যেন এ কাজ করিবার লোক বাংলা দেশে নাই। ফেরিওয়ালা সব অবাঙালী, একাজও বাঙালী করিতে চায় না। মুদী, দারোয়ান, মোটরচালক, ট্যাক্সিচালক, পাচক, ঝি, নাপিত, ছুতার, বেয়ারা, ধোপা,

রাজমিস্ত্রি, মজুর, মুটে, মেথর, মুর্দ্দাফরাশ, কোচম্যান, ঠেলাওয়ালা, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, ছাপাখানার জমাদার কোথাও আর বাঙালী পাওয়া যায় না। নিউমার্কেটের দোকানী প্রায় সব অবাঙালী। তরিতরকারির বাজারেও ক্রমশঃ বাঙালী বিরল হইয়া পড়িতেছে।

পাঁচশত মাইল হাজার মাইল দূর হইতে আসিয়া, অবাঙালী বাংলা দেশে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করে, আর বাঙ্গালী নিজের দেশে তাহা পাবে না। কেন পারে না? ভগবানের অভিসম্পাৎ আছে। বাঙালী কুশিক্ষায় যত দিন শ্রমবিমুখ ও মিথ্যা অভিমানী হইয়া থাকিবে ততদিন তাহার এ দুর্গতি বিধাতাপুরুষও ঘুচাইতে সমর্থ হইবেন না।